World Habitat Day

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১

Accelerating urban action
for a carbon-free world

নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি
কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচি উদ্বোধনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু বলেন,

'আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য, বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়া যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এটা হলো বেরিয়ার, এটা যদি রক্ষা করা না হয়, তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ পর্যন্ত এরিয়া সমুদ্রে তলিয়া যাবে এবং হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার সুন্দরবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোনো উপায় আর নাই।'

সূত্র : সফিউল আযম: বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ প্রেম [প্রকাশিত : ১১:২৪ এ.এম, ০৯ অক্টোবর ২০২০] Jagonews24.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করতে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবার জন্য টেকসই আবাসন নিশ্চিত করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূত্র: বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারণিকায় প্রদত্ত বাণী।

“

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

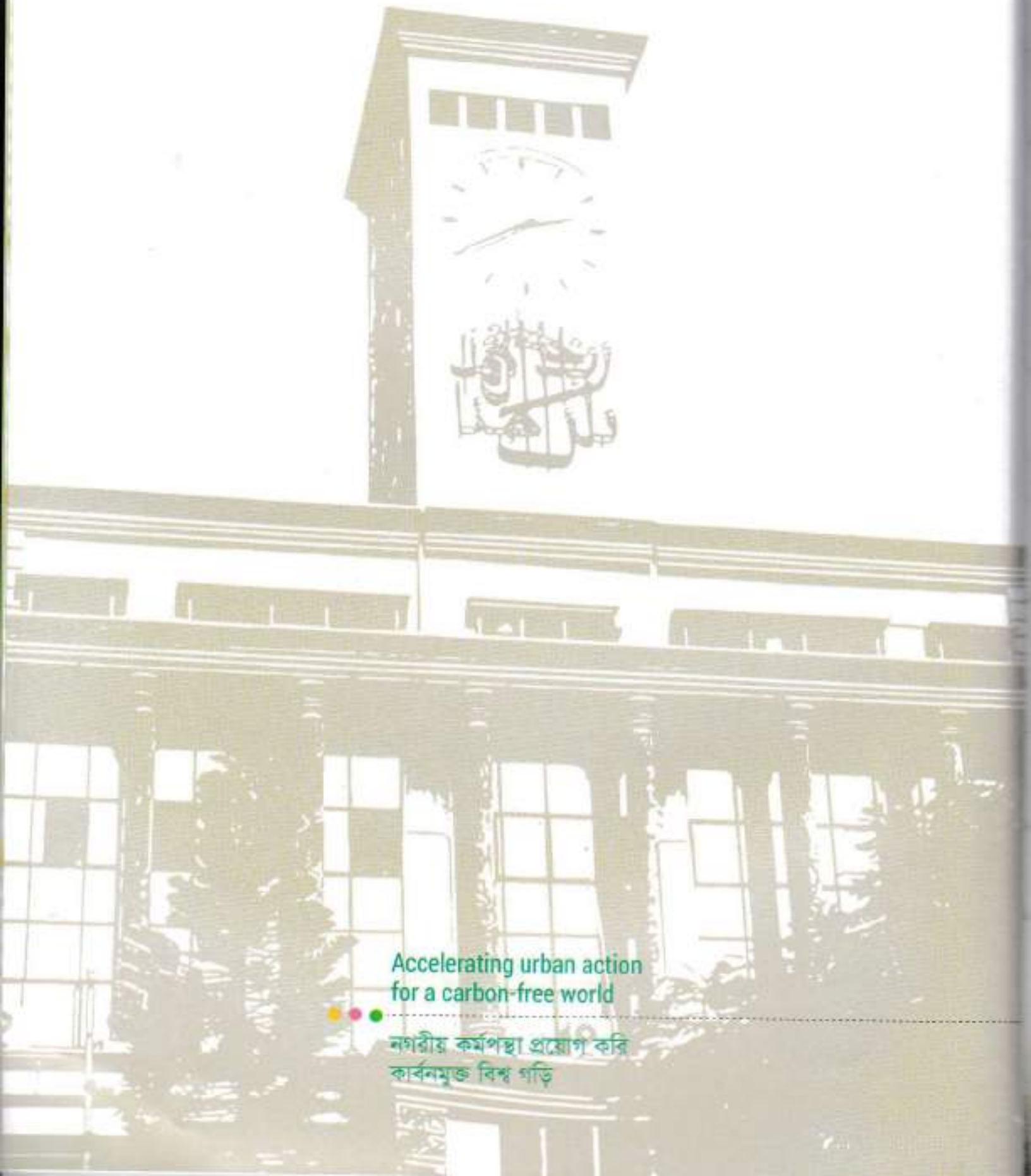

Accelerating urban action
for a carbon-free world

নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি
কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও বাংলাদেশে 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য 'Accelerating urban action for a carbon-free world', যার ভাবার্থ– 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'। বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণের ফলে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতার যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পরিকল্পিত নগরায়নের পাশাপাশি গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের নিঃসরণ কমানো অত্যন্ত জরুরি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের পথ ধরে বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের শহরগুলোও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শহর এলাকায় জনঘনত্ব যেমন বেড়েই চলেছে, তেমনি বেড়ে চলেছে যানবাহন, ভবন এবং যন্ত্রপাতি থেকে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাও। মেগা শহরের পাশাপাশি জেলা, উপজেলায় পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো সম্ভব বলে আমি মনে করি। আধুনিক যুগের বাস্তবতাকে সামনে রেখে সরকার 'National Solar Energy Action Plan : 2021-2041' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও ঢাকা শহরে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের অন্যতম প্রভাবক 'যানজট নিরসনে মেট্রোরেল প্রকল্প, জেলা-উপজেলা শহরে জলবায়ু-সহিষ্ণুভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ঢাকা শহরে 'Urban Resilience' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। অচিরেই বাংলাদেশে বিদ্যুতের কার্বনমুক্ত উৎস হিসাবে রূপপুরে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন শুরু হতে যাচ্ছে।

আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য দেশ গঠনে পরিকল্পিত নগরায়ণের বিকল্প নেই। একই সাথে হাইড্রোকার্বন ভিত্তিক জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির মতো বিকল্প উৎসের সুষ্ঠু ব্যবহারে আরো উদ্যোগী হতে হবে। আমি আশা করি, এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'বিশ্ব বসতি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Accelerating urban action for a carbon-free world' অর্থাৎ, 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'- সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত নগরায়ন ও সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত পরিকল্পনারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি আবাসন প্রকল্পসমূহের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সবুজ এলাকার সমন্বয়ে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রণীত ও প্রণয়নাধীন মহাপরিকল্পনাসমূহেও পরিবেশবান্ধব নগরায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর জন্য প্রণয়নাধীন ভবিষ্যৎ মহাপরিকল্পনা- ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-৩৫)-এ নগরীতে পরিকল্পিত বৃক্ষায়ন, টেকসই উন্নয়ন, দূষণরোধ, উন্নত প্রযুক্তিতে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন পলিসি প্রদান করা হয়েছে, যা গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুত ও এর বহুল ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

নদী ভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুত অসহায় ও বস্তিবাসীসহ দেশের গৃহহীন-ভূমিহীনদের 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে অনুশাসন দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে সরকারি চাকুরিজীবীদের আবাসন সুবিধা ইতোমধ্যে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০২৩ সালে এ আবাসন সুবিধা ২৮ শতাংশে উন্নীত হবে। এ সকল বহুতল আবাসন প্রকল্পে জমির ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশ স্থান উন্মুক্ত রাখা অথবা জলাধারের সংস্থান এবং টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নাগরিক জীবনে কার্বন নিঃসরণ বহুলাংশে কমে যাবে। এছাড়া সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদ এবং ১৮ক এর আলোকে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছে। বাংলাদেশের কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না, ইনশাআল্লাহ।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে কার্বন নিঃসরণমুক্ত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে- এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

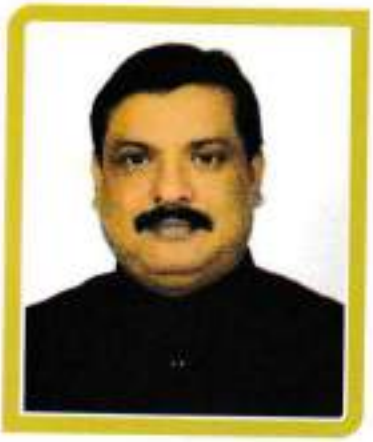

প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বাণী

কার্বন নিঃসরণমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও এ বছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Accelerating urban action for a carbon-free world', যার ভাবার্থ– 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুচিন্তিত পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। অন্যান্য উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও প্রতিনিয়ত নগরায়ণ হচ্ছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও জীবনযাত্রার আধুনিকায়নের সাথে নগর অঞ্চলে কার্বন নিঃসরণ নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের ৭০ শতাংশই আসে নগর এলাকা থেকে। নগর এলাকার যানবাহন, বসতবাড়ি ও কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বর্জ্য কার্বন নিঃসরণের অন্যতম প্রধান উৎস। কার্বন নিঃসরণের সাথে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ছাড়াও নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মারাত্মক রোগ সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার কোনো বিকল্প নেই।

বর্তমানে সরকারের অন্যতম এজেন্ডা 'আমার গ্রাম-আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ। নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনার পাশাপাশি উপজেলাভিত্তিক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (২০১৬-২০৩৫) পরিবেশ দূষণ ও কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য নতুন কিছু উপকরণ যেমন 'নগর জীবনরেখা', 'প্রাকৃতিক উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' ইত্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় প্রতিটি রাস্তার পাশে গাছপালা ও খালের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। সঠিকভাবে নগর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা না হলে তা কার্বন নিঃসরণের উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক ধারণা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এ সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে নগর অঞ্চলে কার্বন নিঃসরণ অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ ভিশন অর্জন করতে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের ধারাবাহিক ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। কার্বন নিঃসরণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এ বছরের প্রতিপাদ্যের আলোকে গৃহীত বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শরীফ আহমেদ, এমপি

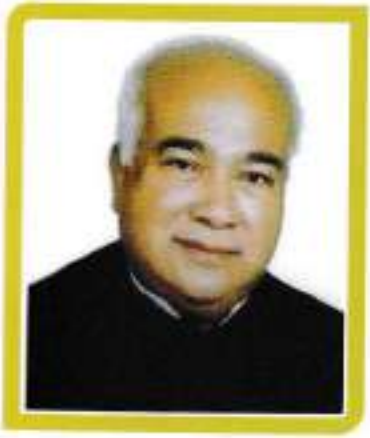

সভাপতি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

প্রেসিডিয়াম সদস্য

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাণী

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

আজ বিশ্ব বসতি দিবস। জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবস, যা ১৯৮৬ সাল থেকে সারা বিশ্বে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, "Accelerating urban action for a carbon-free world", অর্থাৎ, "নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি"।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট ৯ এবং ১১ এর আলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকল্পে সুপরিকল্পিত নগরায়ণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের যুগে কেবলমাত্র টেকসই নগরায়ণের মাধ্যমে নির্মাণশিল্পে কার্বনের নিঃসরণ রোধ করা সম্ভব। বর্তমানে গ্রীন বিল্ডিং টেকনোলজি সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে যার মূলমন্ত্র হলো পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির নির্মাণ উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ল্যান্ডস্কেপিং, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার, প্রচলিত ইটভাটার ইটের বদলে বালি-সিমেন্টের ব্লক ব্যবহার ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এছাড়া সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ব্যবহারের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য শোধন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে প্রচলিত সেপটিক ট্যাংকে উৎপাদিত বিষাক্ত গ্যাসসমূহের বায়ুমণ্ডলে নির্গমন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। নির্মাণ কাজে অধিক কার্বন নিঃসরণকারী ব্লাস্ট ফার্নেস এর পরিবর্তে ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে উৎপাদিত স্টিল ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। অপরদিকে ভবনের দরজা ও জানালায় প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত কাঠের বিকল্প হিসেবে ভিনিয়ার বোর্ড, প্রাইউড, ল্যামিনেটেড বোর্ড ইত্যাদি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে, যা বনভূমি সংরক্ষণকল্পে ভূমিকা পালন করছে। তাই কার্বন নিসঃরণমুক্ত বিশ্বের জন্য নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থাগুলো একযোগে কাজ করছে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে উদ্বুদ্ধকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিত করা ও নিরাপদ আবাস গড়ে তোলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্যতম দর্শন। রূপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর সফল বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশেও নগর পরিকল্পনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে এবং আধুনিক টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবাসন সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই পথিকৃৎ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এমপি

সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বাণী

জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এবছর যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Accelerating Urban Action for a Carbon-free World' বা 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবী আজ জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের হুমকির মুখে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে পড়েছে বাংলাদেশ। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ দিক নির্দেশনায় এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ভিশন অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় গ্রীন স্পেস এর সংস্থান রাখা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ভূমি সংরক্ষণের প্রস্তাবনা রাখাসহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০' এর আওতায় পরিবেশ বান্ধব ইমারত নির্মাণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে ইমারতের নকশা প্রণয়ন, নির্মাণের অনুমোদন ও নির্মাণ কাজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয় গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ইমারত নির্মাণ কৌশলসহ ইমারত নির্মাণ সামগ্রীর উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন ও প্রসারে ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে Green Building, Rain Water Harvesting, Sewerage Treatment Plant, Solar Panel সহ নানাবিধ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এসব আধুনিক ধারণা ও প্রযুক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে ও পরিবেশের উপর উপকারি প্রভাব ফেলবে।

পরিকল্পিত নগরায়ণে বর্তমান সরকারের এ সকল কার্যক্রম দেশের কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি নির্মল পরিবেশ তৈরি করবে এই আমাদের প্রত্যাশা। তবে কেবল সরকারের একক প্রচেষ্টায় কাঙ্খিত লক্ষ্য কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণকেও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উপহার হিসেবে রেখে যেতে পারবো একটি সুন্দর, সবুজ, বাসযোগ্য মানব বসতি।

পরিশেষে আমি বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১ এবং এর প্রতিপাদ্যের আলোকে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

অতিরিক্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রয় এবং প্রতিটি মানুষের বাসস্থান সংস্থানের বিষয় পর্যালোচনা ও নীতি-নির্ধারণী স্থির করার লক্ষ্যে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'। পরিবহণ, ভবন, শক্তি এবং বর্জ্যব্যবস্থাপনাসহ বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমণের প্রায় ৭০ শতাংশের জন্য শহরগুলোই দায়ী। শহরগুলোকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ প্রাণবন্ত এবং টেকসই উন্নয়ন করাই এসডিজি ১১-এর মূল লক্ষ্য।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিকায়নই হচ্ছে আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ডিজিটাল বাংলাদেশ" সংস্থাগুলোকে কম খরচে ও স্মার্ট উপায়ে দ্রুত কার্বনমুক্ত করতে সাহায্য করছে।

স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক শক্তিমান লেখকের লেখা এ স্মরণিকাকে নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্মরণিকা প্রকাশের অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে। মূল্যবান পরামর্শ এবং দিক-নির্দেশনার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার মহোদয়কে।

আ ন ম আল ফিরোজ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শরীফ আহমেদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সম্পাদক

আ ন ম আশ ফিরোজ
অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা সহযোগী

নায়লা আহমেদ
উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মুহম্মদ কামরুজ্জামান
পরিচালক (প্রশাসন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

পূরবী গোলদার
সিনিয়র সহকারী সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) এবং
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সৈয়দা সায়কা বিনতে আলম
প্রজেক্ট অফিসার, এইচবিআরআই, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ
- ইন্সটিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ
- ইন্সটিটিউশন অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউশন অব প্ল্যানার্স

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

নায়লা আহমেদ
উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

০৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৯ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে

প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স লিমিটেড
ফোন: +৮৮ ০২ ৭৩৪১১১৩, ০১৯১৯ ০৩১৯১৭
ই-মেইল: principalbd@gmail.com

সূচিপত্র

০১	কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকল্পে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম শামীম আক্তার	২১
০২	কার্বনমুক্ত ঢাকা মহানগরী বিনির্মাণে রাজউকের ভূমিকা এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী	২২-২৪
০৩	কার্বনমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সকলের জন্য আবাসন বাস্তবায়নে-HBRI মোঃ আশরাফুল আলম, ড. চৌধুরী নাজমা বিনতে আলম	২৫-২৮
০৪	এসডিজি ১১ : টেকসই শহর ও জনগোষ্ঠী আ ন ম ফজলে সিদ্দিক	২৯-৩১
০৫	ফটো গ্যালারি-০১	৩২-৩৩
০৬	জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বঙ্গবন্ধু ও বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০ নাজনীন আহমেদ	৩৪-৪৩
০৭	ফটো গ্যালারি-০২	৪৪-৪৬
০৮	বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ ও কার্বনমুক্ত নগরায়ণ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া	৪৭-৫২
০৯	আমার গ্রাম আমার শহর এ কে এম এ হাকিম	৫৩-৫৪
১০	ফটো গ্যালারি-০৩	৫৫-৬০
১১	কার্বনমুক্ত নগর বাস্তবায়নে পরিবেশবান্ধব বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীর স্থাপনা স্থপতি নাসিম জেহতাসীম পৃথী, শাহরিয়ার খোন্দকার	৬১-৬৪

১২	নির্মাণ কাজে অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট ব্যবহার: নগরের কার্বন দূষণরোধে এর সম্ভাব্যতা মো. আকতার হোসেন সরকার, সৈয়দ আহমেদ কাশফিয়	৬৫-৬৮
১৩	Understanding a Carbon Free World : Actions in the Urban Areas of Bangladesh Prof. Dr. Mohammad Ghulam Murtaza	৬৯-৭২
১৪	নেট কার্বন শূন্য পরিবেশ : নগর উন্নয়ন কি দায়িত্বশীল নগর উন্নয়ন? [illegible] সুমন রায়	৭৩-৭৫
১৫	Comparative Analysis of Conventional Septic Tank and Sewage Treatment Plant (STP) System: Contribution in reducing Carbon Foot Print Mosleh Uddin Ahmed	৭৬-৭৯
১৬	তাপমাত্রা ও কার্বন নিঃসরণের হার হ্রাসে ছাদবাগানের ভূমিকা শাহানা সুলতানা	৮০-৮২
১৭	একটি কার্বন-ফ্রি পৃথিবী ও স্থপতিগণের উদ্যোগ স্থপতি নকিবুর রহমান, স্থপতি শেখ ইকবাল সলিম	৮৩-৮৪
১৮	টেকসই নগরায়ণে রাজউকের অবদান মুহম্মদ কামরুজ্জামান	৮৫-৮৭
১৯	নদীর বালি ব্যবহার করে Interlocking Concrete Pavement Block (ICPB) তৈরির সম্ভাবনা মো: সাখাওয়াত হোসেন, মো: আরিফুজ্জামান, মো. শাহ আলম, মো. নাসিম হোসাইন, মো: সাদ্দাম হোসেন, তারেক রহমান	৮৮-৯১
২০	জলবায়ু পরিবর্তনে অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নেতিবাচক প্রভাব ড. আ.ন.ম. সফিকুল আলম	৯২-৯৪
২১	উপকূলীয় এলাকায় কার্বন দূষণমুক্ত বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী ও দুর্যোগ সহনশীল আবাসন স্থপতি মো. নকিবুর রহমান, স্থপতি নন্দিনী জেবুন্নেসা দৃষ্টি	৯৫-৯৮
২২	Energy Efficiency/Green Energy to Reduce Carbon Footprint in Government Building Management System Ashraful Hoque, Kazi Mashfiq Ahmed, Ajanta Shukla Tanma, Ashraful Hoque, Kazi Mashfiq Ahmed, Ajanta Shukla Tanma	৯৯-১০১
২৩	শহর এলাকায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে করণীয় শাহীন আহমেদ	১০২-১০৪
২৪	ফটো গ্যালারি-০৪	১০৫-১১১
২৫	বৃষ্টির পানি সংগ্রহে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও কার্বনমুক্ত আগামীর বিশ্ব মো: নজিবর রহমান	১১২-১১৫
২৬	কার্বন নিঃসরণ ও আমাদের বাস্তবতা জহুরা খাতুন	১১৬-১১৮
২৭	Zero Carbon Building: An Approach to Reduce Carbon Emission Zinia Hoque Pinki	১১৯-১২১
২৮	কার্বন শূন্য নগরায়ণের সন্ধানে মোহাম্মদ নূর হোসেন খাঁন	১২২-১২৪
২৯	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এ উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী মো. আশরাফুল আলম, ড. সৈয়দা শাহানা বিনতে আলম	১২৫-১৩১
৩০	ফটো গ্যালারি-০৫	১৩২-১৩৯

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসকল্পে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

শামীম আখতার[১]

অর্থনৈতিক বিকাশ আর উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এগিয়ে চলা বাংলাদেশেও কার্বন নিঃসরণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বাস্তবতার নিরিখে। তবে কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গিকার বাস্তবায়নে গণপূর্ত অধিদপ্তর নানামুখী কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এ কর্মপরিকল্পনার আওতায়, ভবন বা অবকাঠামোতে প্রচলিত ইটের বদলে পরিবেশবান্ধব ইট ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। কেননা প্রচলিত ইট-ভাটাগুলোতে জ্বালানি হিসেবে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ কাঠই পোড়ানো হয় না, সেখানে ব্যবহৃত কয়লা থেকে নির্গত হচ্ছে, ধুলিকণা, পার্টিকুলেট কার্বন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইডের মতো ক্ষতিকারক নানান গ্যাস। প্রকৃতি আর মানবস্বাস্থ্যের এ সকল ক্ষতি কমাতে, নির্মাণ শিল্পের অন্যতম সামগ্রী এমএস রড তৈরিতে ব্লাস্ট ফার্নেসের পরিবর্তে ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে এই শিল্প থেকে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমে আসতে শুরু করেছে। একইভাবে কাচের ক্ষেত্রেও পরিবেশের ক্ষতি কম করে এমন লো-এমিশন গ্লাস এবং ডাবল গ্লেজিং গ্লাসের প্রচলন শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর সেন্সর বোর্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ খরচ যেমন কমে এসেছে তেমনি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনও হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

শুধু নির্মাণ উপকরণে নয়, কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভবন নির্মাণের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এনেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। পাইলিং-এর জন্য প্রচলিত ড্রপ হ্যামার বা ডিজেল হ্যামারের বদলে হাইড্রোলিক পুশ হ্যামার ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে বন্ধ হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতিকারক কালো ধোঁয়া। ব্রিক চিপসের বদলে ঢালাইয়ে স্টোন চিপস বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, যার কারণে পোড়া ইটের ব্যবহার অনেকখানি কমিয়ে আনা হচ্ছে যা একদিন স্তব্ধ করবে ইট-ভাটার অস্বাভাবিক কার্বন নিঃসরণ। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কারে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে রেট্রোফিটিংকে। পুরাতন ভবনের স্থায়িত্বকাল বাড়িয়ে নতুন ভবন নির্মাণ কিছুটা কমালে তার সাথে সাথে কমবে এর সাথে জড়িত সকল নির্মাণ উপাদান হতে নিঃসরিত কার্বন।

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে সূর্যের আলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আর সে কারণেই সোলার প্যানেলের দেখা মেলে এখন প্রায় সব প্রকল্পে। বাতাস প্রবাহের ক্ষেত্রে, ভবনের তাপ কমানোর জন্য শেডিং ডিভাইস কাজে লাগানো হচ্ছে। পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও শোধনাগার নির্মাণ করা হচ্ছে গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত- গ্যাস উৎপাদনকারী সেপটিক ট্যাংক আর সোক-ওয়েলের বদলে সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যম বর্জ্য পরিশোধন করায় কমে এসেছে পরিবেশ দূষণ।

সরকারের প্রতিটি প্রকল্পেই সবুজায়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সংরক্ষণ করা হচ্ছে উন্মুক্ত খেলার মাঠ বা সবুজ উদ্যান। তবে শুধু খোলা জায়গাতেই নয়, সবুজ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ভবনের ছাদ বাগান কিংবা দেয়ালে।

পরিবেশবান্ধব নীতি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে চলেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর। কৃষিজমি, বনাঞ্চল, জলাভূমি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা বিবেচনায় নিয়েই দেশজুড়ে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন করছে সংস্থাটি। ভূমির ব্যবহার কমাতে, নির্মাণ করা হচ্ছে সমন্বিত সরকারি ভবন। মাটির প্রকৃতি যেন পরিবর্তন না হয়, সেজন্য ভবনের বাইরের উন্মুক্ত স্থানকে প্রয়োজন ছাড়া পাকা করা হচ্ছে না।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকল্পে শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্যানই নয়, স্থাপন করা হয়েছে ইনভার্টার যুক্ত এয়ারকুলার, যেগুলোতে সিএফসি মুক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ভবনের পানির পাম্পে যুক্ত করা হয়েছে সেন্সর, যাতে বিদ্যুতের অপচয় ঠেকানো যায়। স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল কার পার্কিং ব্যবস্থা।

---

[১] প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

কার্বনমুক্ত ঢাকা মহানগরী বিনির্মাণে রাজউকের ভূমিকা

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী[১]

একটি বাসযোগ্য, নিরাপদ বাসস্থান প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। সকলের জন্য উপযুক্ত আবাসন নিশ্চিতকরণ ও সে সম্পর্কে গণ-সচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে UN-Habitat কর্তৃক ঘোষিত "বিশ্ব বসতি দিবস" প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো : "Accelerating urban action for a carbon-free world" অর্থাৎ 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'।

বাংলাদেশের একমাত্র মেগাসিটি হিসেবে ঢাকা মহানগরী দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। তবে ক্রমবর্ধমান ভবন নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও যান চলাচলের জন্য ঢাকার কার্বন ফুটপ্রিন্ট উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাই সময় এসেছে কার্বনমুক্ত, পরিবেশবান্ধব নগরায়ণের, যা ঢাকা মহানগরীকে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধে ভূমিকা রাখবে এবং সামগ্রিক বসবাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। ঢাকা মহানগরীর একটি কেন্দ্রীয় নগর পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হিসাবে রাজউক ঢাকা মহানগরীকে একটি সুপরিকল্পিত মেগাসিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৩ মোতাবেক ১৯৫৬ সালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তী সময়ে রাজউক নামকরণ করা হয়। এই অ্যাক্টের আওতায় ১৯৫৯ সালে ৩২০ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী ঢাকা শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও এলাকা সম্প্রসারণের সাথে সাথে নতুন প্ল্যান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৮৭ সালে ঢাকা শহরের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করে ৫৯০ বর্গমাইল (১৫২৮ বর্গ কি.মি.) করা হয় এবং ১৯৯৫ সালে উক্ত এলাকাব্যাপী ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫) প্রণয়ন করা হয়। এরপর ধাপে ধাপে প্রণয়ন করা হয়েছে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১০-২০১৫), খসড়া ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫), খসড়া ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-৩৫)সহ অন্যান্য মহাপরিকল্পনা যেখানে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পুরান ঢাকার বিভিন্ন জরাজীর্ণ এলাকা নগর পুনঃউন্নয়ন (Urban redevelopment)-এর মাধ্যমে বহুতল মিশ্র-ব্যবহার ভবন নির্মাণসহ পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধাদি ও খোলা জায়গার সমন্বয়ে পরিকল্পিত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[১]চেয়ারম্যান, রাজউক, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বর্তমান অবস্থার অসুবিধা — অসুবিধা থেকে উত্তরণের উপায়

চিত্র ১: পুরান ঢাকায় নগর পুনঃউন্নয়নের কনসেপ্ট প্ল্যান।

নবায়নযোগ্য দ্রব্য ও জ্বালানি ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ যেমন লো-কার্বন সিমেন্ট ব্যবহারসহ কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর আরো একটি কৌশল হলো উলম্ব উন্নয়ন (vertical development)-এর মাধ্যমে built-up এলাকার পরিমাণ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা এবং সবুজায়ন ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে যথাসম্ভব খোলা এলাকা, বনাঞ্চল ও কৃষি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। রাজউক বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত আবাসিক প্রকল্পসমূহে প্লটভিত্তিক আবাসনের পরিবর্তে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণকে উৎসাহিত করছে। রাজউকের উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প, হাতিরঝিল ফ্ল্যাট প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব বহুতল ভবনে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারসহ ছাদ-বাগান, গ্রিন বিল্ডিং প্রভৃতি ধারণাসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। রাজউকের প্রণয়নাধীন ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬–৩৫)-এ ব্লকভিত্তিক মিশ্র উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব জোনিং (density zoning)-এর মাধ্যমে ভবনসমূহের built-up এলাকা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা ড্যাপ ও ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা- ২০০৮ লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণরোধে সরেজমিনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি জাইকার অর্থায়নে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইনসমূহের স্টেশন এলাকায় transit-oriented development (TOD) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা ব্লকভিত্তিক, বহুতল, মিশ্র ভূমি ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে।

চিত্র ২: ঢাকার ফার্মগেট এলাকায় প্রস্তাবিত TOD-এর কনসেপ্ট প্ল্যান।

বহুতল উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বৃক্ষায়ণের মাধ্যমে নগরীর সামগ্রিক কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যেও রাজউক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রণয়নাধীন ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬–৩৫)-এ ঢাকা মহানগরীর প্রধান সড়কসমূহকে সবুজায়নের মাধ্যমে নগর জীবনরেখা (urban lifeline) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ, পার্ক, খোলা এলাকা সংস্থানের প্রয়োজনীয় স্ট্রাটেজি সুপারিশ করা হয়েছে। বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০১২, ২০১৫) অনুসারে রাজউক অনুমোদিত বেসরকারি আবাসন প্রকল্পসমূহেও একইভাবে জনসংখ্যার অনুপাতে খেলার মাঠ, পার্ক, ওয়াটার বডি প্রভৃতির জন্য পর্যাপ্ত জায়গা সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

চিত্র ৩: প্রণয়নাধীন ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬–৩৫)-এ নগর জীবনরেখার প্রস্তাবনা।

পরিশেষে, ঢাকা মহানগরীকে একটি পরিকল্পিত, নিরাপদ ও কার্বনমুক্ত মেগাসিটি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য রাজউকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা নগরীর উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল সংস্থার সহযোগিতা ও সমন্বিত উদ্যোগও এক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রয়োজন। এছাড়া রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সময়োপযোগী আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করতে হবে। জনসাধারণের সচেতনতাও পরিকল্পিত নগর বিনির্মাণের মূল হাতিয়ার। আশা করা যায়, সকলের সহযোগিতায় অদূর ভবিষ্যতেই একটি কার্বনমুক্ত ঢাকা মহানগরীর বিনির্মাণের পথ সুপ্রশস্ত হবে।

কার্বনমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সকলের জন্য আবাসন বাস্তবায়নে-HBRI

মোঃ আশরাফুল আলম[১]
ড. সৈয়দা সায়কা বিনতে আলম[২]

১. প্রেক্ষাপট

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে সংগঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস এগ্রিমেন্ট-এ বিশ্বের সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। কেননা তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর বেশি বৃদ্ধি পেলে তা সর্বত্র মানুষের জীবন ও জীবিকার উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এই তাপমাত্রা ধরে রাখার জন্য বাতাসে কার্বনের পরিমান শূন্যের কোঠায় আনয়ন করা এখন কার্যত মানব সম্প্রদায়ের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এরই ধারাবাহিকতায়, "Accelerating Urban Action for a Carbon-free World" প্রতিপাদ্য নিয়ে আগামী ৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বিশ্ববসতি দিবস উদযাপনের উদ্যোগ যেন এখন এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রথম শর্ত।

বিশ্ববসতি দিবসের মূল উদ্দেশ্য হল, বিশ্বের সকল শহরের সার্বিক চিত্র সাধারণ জনগণের কাছে তুলে ধরা এবং বাসস্থান সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের প্রতিফলন ঘটানো। প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার UN Habitat আয়োজিত বিশ্ববসতি দিবসে বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তার প্রতিকার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপনের জন্য যুক্তিযুক্ত ও চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে সমর্থন করে এমন একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়, আর এবারের বিশ্ববসতি দিবসের প্রতিপাদ্য HBRI এর গবেষণালব্ধ সামগ্রিক কর্মকান্ডকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন করে।

আমরা জানি যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নিজস্ব নির্মাণ সামগ্রী ও সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ও দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৩ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সেন্টারটি হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রতিষ্ঠানে সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও টেকসই আবাসন সহজলভ্য করা এবং দেশের নির্মাণ শিল্পের গুণগতমান বৃদ্ধি বিষয়ক লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণার পাশাপাশি উদ্ভাবিত উপকরণ, প্রযুক্তি বিপণন ও সম্প্রসারণ, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে গৃহায়ন ও নির্মাণ বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান নির্মাণ শিল্পের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিত পরিচালনা করা হয়।

---

[১]মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
[২]প্রজেক্ট অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

২. ইট উৎপাদনে এশিয়া ও বাংলাদেশের ভূমিকা

বিশ্বে ইট উৎপাদনে এবং ব্যবহারে এশিয়াই শীর্ষে। সারা বিশ্বে প্রতিবছর অসংখ্য পোড়ামাটির ইট উৎপাদিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি ইটের উপাদান ও ব্যবহার হয়ে থাকে। বলা হয় যে, শুধুমাত্র এশিয়া মহাদেশ থেকেই প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি ইট প্রস্তুত করা হয়। চিত্র-১ US, EPA, ২০১২ থেকে নেয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিশাল উৎপাদন মূলত চীন, ভারত ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে আসে। এটা সত্য যে, ইট শিল্প একটি জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার এটাও সত্য, বৈশ্বিক মানবসৃষ্ট কার্বন নিঃসরণের ১.২ শতাংশই আসে কেবল এশিয়ার ইটভাটা হতে, যা ইট উৎপাদন প্রযুক্তির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে, ইট শিল্প সাধারণত গৃহায়ন এবং অন্যান্য অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এটি নিশ্চিত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ইট উৎপাদনকারী দেশ। এই শিল্প দেশের জিডিপির প্রায় ১%। স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যাপক ইটের উৎপাদন ও প্রচলিত ইট শিল্প বাতাসে বিপুল পরিমানে CO_2 নিঃসরণ করে, যা গ্রিনহাউস গ্যাস (GHG) এর প্রধান অবদানকারী হিসাবে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে বাতাসে CO_2 নির্গমন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রবণতা ত্বরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা উপরে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে (USDOE, 1993)। এদিকে, এ অঞ্চলের ভাটাগুলো ইট প্রস্তুত করতে বিপুল পরিমাণে কৃষিজমির মাটি ব্যবহার করে। দেশে, বছরে শতকরা ১ ভাগ কৃষিজমির উর্বর মাটি শুধুমাত্র ইট উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে মূল্যবান বনজ সম্পদ। যার প্রভাবে ঢাকা ও চার পার্শ্বের ৫৮ ভাগ বায়ু দূষণই হচ্ছে পার্শ্ববর্তী ইট ভাটাসমূহের কারণে।

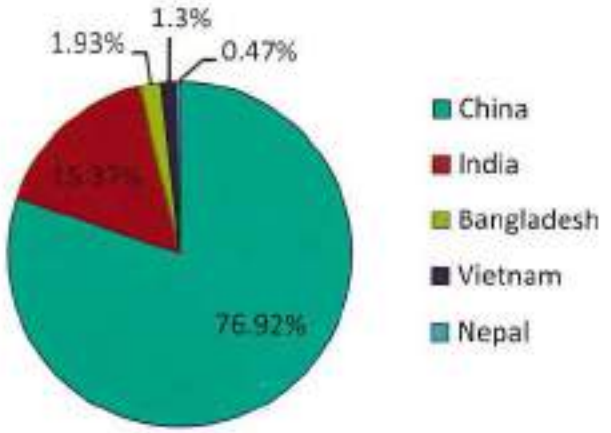

চিত্র : ১ **Brick Production in Asian Country;**
Source: US, EPA, 2012

বাংলাদেশ, বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তালিকাভুক্ত। প্রায় ১৬ কোটির অধিক জনসংখ্যার এই দেশে উন্নয়ন চলছে প্রতিটি স্তরে। রাস্তাঘাট, পদ্মা সেতুসহ বিভিন্ন সেতু নির্মাণ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু টানেল ও মেট্রোরেলের সংযোজন থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক বিমানবন্দর নির্মাণ পর্যন্ত সকল উন্নয়নের চিত্র এখন দৃশ্যমান। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতার কথা চিন্তা করে সরকার দেশকে বায়ুদূষণের প্রভাবমুক্ত করতে সর্বদা সচেষ্ট।

৩. কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকারের পদক্ষেপ

কার্বনমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, HBRI গত কয়েক বছর ধরে পোড়ামাটির ইটের বিকল্প হিসেবে বালি, সিমেন্ট অথবা এডমিকচার ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবন করে চলছে। ২০১৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে HBRI এর প্রতি সুনির্দিষ্ট অনুশাসনের মাধ্যমে এ সকল গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। HBRI এর প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন গুলোতে নির্দেশনা ছিল যে, উদ্ভাবিত নির্মাণ সামগ্রীর প্রচারের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে হবে। এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, আশ্রায়ন প্রকল্পে এবং পল্লী জনপদ প্রকল্পে HBRI এ উদ্ভাবিত ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার শুরু করা ও নদী ড্রেজিংকৃত বালি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী তৈরি করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণার নির্দেশনা ছিল। HBRI, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল অনুশাসন বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রচার প্রসারের জন্য ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা সহ প্রচুর গবেষণাপত্র ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ে নিয়মিত আলোচোনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আর ডি এ বগুড়ার পল্লীজনপদ প্রকল্পে ফেরোসিমেন্টের ব্যবহার করা হয়েছে এবং নদী ড্রেজিংকৃত বালি ব্যবহার করে যে গবেষণা কার্যক্রম করা হচ্ছে তার বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৪. HBRI-এ উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী

ইতোমধ্যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের সিডিউল অফ রেইট-২০১৮ তে HBRI উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ সামগ্রীর আলোচনা নিম্নে করা হচ্ছে:

(ক) **Compressed Stabilized Earth Block (CSEB):** ড্রেজিং সয়েলের সাথে ১০% সিমেন্ট মিশিয়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে Compressed Stabilized Earth Block (CSEB) তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ব্লক ব্যয় সাশ্রয়ী, বনজ সম্পদ ব্যবহার রোধ করে, কার্বন নির্গমন হ্রাস করে, ড্রেজিং সয়েল ব্যবহারের কারণে নদ নদীর নাব্যতা রক্ষা হয়, পরিবেশে সুরক্ষা দেয় এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে (চিত্র-২)।

(খ) স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক (Sand Cement Hollow Block): কনক্রিট হলো ব্লক (Concrete Hollow Block) ভারবাহী বা অ-ভারবাহী দেয়াল নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। হলো ব্লক ভালো অন্তরক হিসাবে কাজ করে এবং এটি শব্দ, তাপ ও আদ্রতা প্রতিরোধক। সাধারণত ২০% সিমেন্ট এবং ৮০% বালি মিশিয়ে এই ব্লক তৈরী করা হয়। এই ব্লকগুলো কৃষি জমি ও বনজ সম্পদের অপচয় রোধ করে। এটি তৈরিতে কোন জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে না। সারাবছরব্যাপী উৎপাদন করা সম্ভব। এই ব্লকগুলোর শব্দ শোষণ ক্ষমতা বেশি এবং অগ্নি ও তাপ নিরোধে অধিক কার্যক্ষম (চিত্র-৩)।

(গ) স্যান্ড সিমেন্ট সলিড ব্লক (Sand Cement Solid Block): ড্রেজিং বালির সাথে সামান্য পরিমানে সিমেন্ট এবং এইচবিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত এডমিক্সার (এইচবিআরআই ক্যামিকেল) মিশিয়ে উচ্চ মানের Non Fired Sand Cement Solid ব্লক তৈরি করা হয়। এগুলো ব্যয়সাশ্রয়ী, টেকসই এবং Compressive Strength পোড়া ইটের সমমান। Water Absorption কম, শব্দ ও তাপরোধী (চিত্র-৪)।

(ঘ) লো কস্টের স্যান্ড **সিমেন্ট হলো ব্লক:** এই ব্লক তৈরিতে HBRI উদ্ভাবিত কেমিক্যাল/ এডমিকচার এর সাথে সিমেন্ট ও ড্রেজিং স্যান্ড ব্যবহার করা হয়। যার অনুপাত হচ্ছে ১:৪। এর সাথে ০.১% থেকে ০.৫% পর্যন্ত কেমিক্যাল/ এডমিকচার ব্যবহার করে তৈরিকৃত হলো ব্লকের compressive strength সর্বোচ্চ ২৪০০ পিএসআই পাওয়া যায়। এই ব্লকগুলোও পরিবেশবান্ধব এবং ব্যয় সাশ্রয়ী (চিত্র-৫)।

এছাড়া প্রচলিত ইটের বিকল্প হিসেবে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশসমূহ Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Block ব্যবহার করে। AAC ব্লক বা প্যানেল দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ, যথা ভারত, চীন ও মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ দেশ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করে আসছে। AAC ব্লক সাধারণত বালি (ড্রেজড স্যান্ড হতে পারে), লাইম, এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, অল্প পরিমান সিমেন্ট মিশিয়ে অটোক্লেভিং করে প্লান্ট

চিত্র : ২ CSEB ব্লক

চিত্র : ৩ স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক

চিত্র : ৪ স্যান্ড সিমেন্ট সলিড ব্লক

চিত্র : ৫ লো কস্টের স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক

চিত্র : ৬ Autoclaved Aerated Concrete (ACC) ব্লক

চিত্র : ৭ এইচ বি আর আই-এ পাইলট প্লান্ট AAC

এর মাধ্যমে নন ফায়ার কংক্রিট ব্লক হিসেবে উৎপাদন করা হয়। এই ব্লকগুলোও ব্যয় সাশ্রয়ী, লাইট ওয়েট, পরিবেশবান্ধব গ্রীণ ম্যাটেরিয়ালস। এই ব্লক গুলোর আরো একটি বৈশিষ্ট হলো এগুলো ভূমিকম্প সহনীয় ও অগ্নি প্রতিরোধক। এদিকে AAC প্লান্ট স্থাপন করাও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। কারণ এই প্লান্টগুলো থেকে স্বল্প শ্রমিক ও ব্যয়ে অধিক পরিমানে ব্লক, ওয়াল প্যানেল এবং ফ্লোর প্যানেল প্রস্তুত করা সম্ভব। HBRI-এ বর্তমানে একটি পাইলট প্লান্টের কাজ চলমান রয়েছে। পাইলট প্লান্টের Capacity 200m^3 ধরা হয়েছে। বর্তমান পেক্ষাপটে এই প্রযুক্তিতে নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং ব্যয়সাশ্রয়ী (চিত্র-৬ ও ৭)।

৫. উপসংহার

HBRI- এর লক্ষ্য শুধু পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনই নয় বরং পাশাপাশি সারাদেশে বিশেষত বিভাগীয় শহরগুলোতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব ইট ও ব্লক নির্মাণের কারখানায় পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা প্রদান করে বাংলাদেশকে গ্রীন টেকনোলজিতে উদ্বুদ্ধ করা। বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীসহ AAC ব্লক, ফেরোসিমেন্ট টেকনোলজিতে তৈরিকৃত Slab panel অথবা wall panel এর সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এছাড়াও সারাদেশে যে কয়টি অল্টারনেটিভ ব্লক তৈরির কারখানা রয়েছে তা HBRI এর web portal-এ গেলে digital mapping এর মাধ্যমে সহজেই শনাক্ত করা যায়। বর্তমানে HBRI এর গবেষকগণ শুধু ইটের বিকল্পই নয় সিমেন্ট-এর বিকল্প নিয়েও গবেষণা করছেন যেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ রূপে কার্বন মুক্ত নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে যথাযথ ডেসিমিনেশন করা আবশ্যক। কেননা পর্যাপ্ত প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমেই সাধারণ জনগণ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। তাছাড়া HBRI হতে জাতীয় বিল্ডিং কোড-২০২০ এর বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে। তাই পরিশেষে বলা যায় HBRI এর সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষণা কার্যক্রম এবারের বিশ্ববসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে শতভাগ প্রাসঙ্গিক।

নিচে HBRI-এ স্থাপিত কিছু স্থাপনার চিত্র দেয়া হলো যেগুলোতে পরিবেশবান্ধব ও প্রায় কার্বনমুক্ত ভাবে নির্মিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে (চিত্র ৮-১০)।

চিত্র : ৮ ডিসপ্লে সেন্টার এর সম্মুখভাগ

চিত্র : ৯ স্যান্ডউইচ প্যানেল ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে নির্মিত ৫ তলা ভবন

চিত্র : ১০ পরিবেশবান্ধব ব্লক ব্যবহার করে তৈরি প্রতিষ্ঠানের মূল ফটক

তথ্যসূত্র:

১. Bell, Michelle L. "Assessment of the health impacts of particulate matter characteristics." Research Report (Health Effects Institute) 161 (2012): 5-38.
২. DeForest, David K., and Eric J. Van Genderen. "Application of US EPA guidelines in a bioavailability-based assessment of ambient water quality criteria for zinc in freshwater." Environmental toxicology and chemistry 31.6 (2012): 1264-1272.
৩. https://www.athensjournals.gr/reviews/2020-4059-AJSS.pdf
৪. https://news.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=93290

এসডিজি ১১ : টেকসই শহর ও জনগোষ্ঠী

আ ন ম আল ফিরোজ[1]

টেকসই শহর ও জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিষয়ই হলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ১১। এটি ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Goals) মধ্যে একটি- যা ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসডিজি ১১ হলো শহরগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, প্রাণবন্ত এবং টেকসই উন্নয়ন করা। এসডিজির ১৭টির মধ্যে যে কোন একটি ক্ষেত্রের উপরে পদক্ষেপ নিলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা অবশ্যকে প্রভাবিত করবে এবং সেই উন্নয়ন অবশ্যই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত স্থায়ীত্বের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

এসডিজি ১১ এর লক্ষ্যগুলির (Targets) মধ্যে রয়েছে অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে সবুজ সৃজন, গণপরিবহনে বিনিয়োগ, পাবলিক স্পেস তৈরি করা এবং নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা।

এসডিজি ১১-এর ১০টি লক্ষ্য রয়েছে এবং এটি ১৫টি নির্দেশক দিয়ে পরিমাপ করা হচ্ছে। সাতটি ফলাফলমুখী লক্ষ্যের (outcome targets) মধ্যে রয়েছে:

(১) নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন;

(২) সাশ্রয়ী এবং টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা;

(৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই নগরায়ণ;

(৪) বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা;

(৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমানো;

(৬) শহরের পরিবেশগত প্রভাব কমানো;

(৭) নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্ত সবুজ এবং পাবলিক স্পেসগুলিতে অ্যাক্সেস প্রদান করা।

লক্ষ্য অর্জনের তিনটি মাধ্যমের (ways) মধ্যে রয়েছে:

(১) শক্তিশালী জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা;

(২) অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ দক্ষতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নীতি বাস্তবায়ন;

(৩) টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ভবনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সমর্থন করা।

২০১৮ সালে ৪.২ বিলিয়ন মানুষ, বা বিশ্বের জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ লোকজন শহরগুলোতে বাস করতো। ২০৫০ সালের মধ্যে শহরে জনসংখ্যা ৬.৫ বিলিয়নে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আমাদের শহরে জায়গাগুলো নির্মাণ ও পরিচালনার পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন না করে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা যাবেনা। শহরগুলো পৃথিবীর ভূমির মাত্র ৩ শতাংশ দখল করে, কিন্তু ৬০-৮০ শতাংশ শক্তি খরচ এবং ৭৫ শতাংশ কার্বন নিসরণের জন্য দায়ী।

---

[1] অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

বস্তিবাসীর সংখ্যা ২০১৮ সালে ১ বিলিয়নেরও বেশি, বা শহুরে জনসংখ্যার ২৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বস্তি বা অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। ২০১৯ সালে বিশ্বের অর্ধেক শহুরে জনসংখ্যার পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার ছিল।

"২০৫০ সালের মধ্যে ৬.৫ বিলিয়ন মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ হবে শহরাঞ্চলে। জাতিসংঘের মতে, আমরা আমাদের শহরে জায়গাগুলো যেভাবে গড়ে তুলি এবং পরিচালনা করি তা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন না করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর বাইরে গণ-স্থানান্তরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ফলে শহরের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি মেগা-শহরগুলোতে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে এবং বস্তিগুলো শহুরে জীবনের একটি উল্লেখযোগ্যবৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে। ২০০০ এবং ২০১৪ এর মধ্যে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের অনুপাত ৩৯ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। যাহোক, বস্তিতে বসবাসকারী নিখুঁত সংখ্যা ২০০০ সালে ৭৯২ মিলিয়ন থেকে ২০১৪ সালে আনুমানিক ৮৮০ মিলিয়ন হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাম থেকে শহরে চলাচল ত্বরান্বিত হয়েছে এবং উন্নত আবাসন বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে।

লক্ষ্য, নির্দেশক এবং অগ্রগতি

লক্ষ্য ১১.১ : নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন

"২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন এবং মৌলিক পরিষেবা এবং বস্তি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।" এ লক্ষ্যের নির্দেশক হলো: "বস্তি পরিবারে বসবাসকারী শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত।" যারা বস্তিতে বাস করে তাদের বিশুদ্ধ পানি, উন্নত স্যানিটেশন, পর্যাপ্ত বাসস্থান এবং টেকসই আবাসনের প্রবেশযোগ্য করা দরকার।

লক্ষ্য ১১.২ : সাশ্রয়ী এবং টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা

"২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার প্রদান, সড়ক নিরাপত্তার উন্নতি, বিশেষ করে গণপরিবহন সম্প্রসারণের মাধ্যমে, দুর্বল পরিস্থিতিতে তাদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের পরিবহনের সুব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যমাত্রার একটি নির্দেশক হলো: "জনসংখ্যার অনুপাত যা লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা জনসাধারণের পরিবহনে সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার।" ২০১৯ সালে বিশ্বের শহুরে জনসংখ্যার মাত্র অর্ধেকই জনসাধারণের পরিবহনে সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, যাকে কম ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবহন ব্যবস্থা (যেমন একটি বাস স্টপ) থেকে ৫০০ মিটার হাঁটার দূরত্বে এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবহণের ১ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

লক্ষ্য ১১.৩ : অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই নগরায়ণ

"২০৩০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই নগরায়ণ এবং সকল দেশে অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত এবং টেকসই মানব বসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।" লক্ষ্যটির দুটি নির্দেশক রয়েছে: (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে ভূমি ব্যবহারের হারের অনুপাত। অপরটি (২) নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কাঠামোসহ শহরের অনুপাত যা নিয়মিত এবং গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করে।

লক্ষ্য ১১.৪ : বিশ্বের সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা

"বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা ও সুরক্ষার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করা।" এটির একটি নির্দেশক রয়েছে: "সমস্ত সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের উপর মোট মাথাপিছু ব্যয়, অর্থের উৎস (সরকারি, ব্যক্তিগত), ঐতিহ্যের ধরণ (সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক) এবং সরকারের স্তর (জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয়/পৌরসভা)।"

লক্ষ্য ১১.৫ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব কমানো

"২০৩০ সালের মধ্যে, মৃত্যুর সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং জল সম্পর্কিত দুর্যোগসহ দুর্যোগের কারণে সৃষ্টবৈশ্বিক মোট দেশীয় উৎপাদনের তুলনায় প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা। দরিদ্র এবং দুর্বল পরিস্থিতিতে মানুষকে রক্ষা করা।" এটির দুটি নির্দেশক রয়েছে: (১) প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায় দুর্যোগে দায়ী মৃত্যুর সংখ্যা, নিখোঁজ ব্যক্তি এবং সরাসরি আক্রান্ত ব্যক্তি। এখানে পরিমাপ করা নির্দেশকগুলো অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, নিখোঁজ ব্যক্তি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে

বাস্তুচ্যুত মোট সংখ্যা সম্পর্কে রিপোর্ট করা। (২) বৈশ্বিক জিডিপির সাথে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতি, সমালোচনামূলক অবকাঠামোর ক্ষতি এবং দুর্যোগের জন্য দায়ী মৌলিক সেবায় বিঘ্নের সংখ্যা।

লক্ষ্য ১১.৬ : শহরের পরিবেশগত প্রভাব কমানো

"২০৩০ সালের মধ্যে বাতাসের গুণমান এবং পৌরসভা এবং অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়বিশেষ মনোযোগ দেওয়াসহ শহরগুলোর প্রতি মাথাপিছু পরিবেশগত প্রতিকূলতা হ্রাস করা।"লক্ষ্যটির দুটি নির্দেশক রয়েছে: (১) পৌরসভার কঠিন বর্জ্যের অনুপাত শহরগুলোর দ্বারা উৎপাদিত মোট পৌর বর্জ্য থেকে নিয়ন্ত্রিত সুবিধায় সংগ্রহ এবং পরিচালিত করা। (২) শহরে সূক্ষ্ম কণা বস্তুর বার্ষিক গড় মাত্রা বাতাসে কণা পদার্থ (পিএম) কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম এবং অন্যান্য প্রধান অঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারে।

লক্ষ্য ১১.৭ : নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্ত সবুজ এবং পাবলিক স্পেসগুলিতে প্রবেশযোগ্য প্রদান করা

"২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রবেশযোগ্য, সবুজ এবং পাবলিক স্পেসগুলোতে বিশেষ করে নারী ও শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা।"এর দুটি নির্দেশক রয়েছে: (১) শহরগুলোর অন্তর্নির্মিত এলাকার (বিল্টআপ এলাকা) গড় অংশ যা লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধীদের দ্বারা সকলের জন্য সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত স্থান। (২) শারীরিক, যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তির অনুপাত, লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতার অবস্থা এবং সংঘটনের স্থান দ্বারা নির্ণিত। ২০১৯ সালে সংগৃহীত তথ্য দেখায় যে, ২০০০-২০১৫ সময়ের মধ্যে, বেশিরভাগ শহরাঞ্চলে জনপ্রতি বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাণে সাধারণ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। অসংখ্য শহরে মাথাপিছু বিল্ট-আপ এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে।

লক্ষ্য ১১. এ : শক্তিশালী জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পাদন করা

"জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করে শহরে, পৌর-নগর এবং গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ইতিবাচক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সংযোগগুলোকে সমর্থন করা।" এটির একটি নির্দেশক রয়েছে: এমন দেশগুলির সংখ্যা যাদের জাতীয় নগর নীতি বা আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে যা (ক) জনসংখ্যার গতিশীলতায় সাড়া দেয়; (খ) সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে এবং (গ) স্থানীয় আর্থিক বৃদ্ধি করে। এই নির্দেশকটি বেঞ্চমার্কের অন্যতম প্রধান মেট্রিক এবং নগরায়ণ পর্যবেক্ষণ করে।

লক্ষ্য ১১.বি : অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ দক্ষতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য নীতি বাস্তবায়ন করা

"২০২০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ দক্ষতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি প্রশমন এবং অভিযোজন, দুর্যোগের প্রতি স্থিতিস্থাপকতা, উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য শহর ও মানব বসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সর্বস্তরের সর্বাত্মক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।" ২০৩০ সালের এসডিজির লক্ষ্যবস্তুতে থাকা বেশিরভাগ এসডিজির বিপরীতে এই নির্দেশকটি ২০২০ সালের মধ্যে অর্জনের বিষয়টি রয়েছে।এটির দুটি নির্দেশক রয়েছে: (১) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা। (২) স্থানীয় সরকারগুলোর অনুপাত যা জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশলগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করা।

লক্ষ্য ১১.সি : টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক নির্মাণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সমর্থন করা

"স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ভবন নির্মাণে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সমর্থন করা।" এই লক্ষ্যমাত্রার একটি নির্দেশক রয়েছে: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থিক সহায়তার অনুপাত যা স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে টেকসই, স্থিতিস্থাপক এবং সম্পদ-দক্ষ ভবন নির্মাণ এবং পুনর্নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

তথ্যসূত্র

১. United Nation's Resolution
২. UN Statistics Division
৩. Wikipedia
৪. [illegible]

ভবন
৯ মে ২০২১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অবশিষ্ট মূল অধিবাসী ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্লট বরাদ্দপত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। (৯ মে ২০২১)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী মোঃ শরীফ আহমেদ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অবশিষ্ট মূল অধিবাসী ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্লট বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হন। (৯ মে ২০২১)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী এমপি রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ
২নং সংসদ ভবনের সংস্কারোত্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন এবং
২নং সংসদ সদস্য ভবনের সংস্কারোত্তর উদ্বোধন করেন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাভার স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন

জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে বঙ্গবন্ধু ও বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০

নায়লা আহমেদ[১]

পৃথিবীর আদি থেকেই জলবায়ু পরিবর্তনশীল, অন্তত ভূতাত্ত্বিক সময়পঞ্জিকা আমাদের তাই বলে। পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বরফ যুগ ও উষ্ণ যুগ এসেছে। কিন্তু এ পরিবর্তনসমূহ ছিল প্রাকৃতিক। জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তঃসরকার পরিষদের (আইপিসিসি) IPCC-এর সকল রিপোর্টেই বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রাকৃতিক নয় বরং মানবসৃষ্ট হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়।[১] সম্প্রতি মনুষ্য কর্মকাণ্ড যেমন নগরায়ণের হার, কলকারখানার পরিমাণ, বনভূমি উজাড় অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এতটাই বেড়েছে যার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেনসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে অস্বাভাবিক গতিতে। এ আশঙ্কাই প্রতিফলিত হয়েছে গত ৯ আগস্ট, ২০২১-এ প্রকাশিত IPCC ৬ষ্ঠ প্রতিবেদন (AR6)। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পৃথিবীর উষ্ণতা যেভাবে বাড়ছে তাতে চূড়ান্ত বিপদখাঁড়ির কিনারে মানবসভ্যতা। দ্রুত জলবায়ু বদলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ গলে যাওয়া, তাপদাহ, বন্যা আর খরার মতো ঘটনা বাড়ছে মানুষের নানা কার্যক্রমের কারণেই। এ প্রতিবেদনকে মানবজাতির জন্য সর্বোচ্চ সতর্কবার্তা বা "রেড কোড" হিসেবে বর্ণনা করে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস জ্বালানি হিসেবে কয়লা এবং উচ্চমাত্রায় দূষণ কমানো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।[২]

বাংলার জনপদ, নদ-নদী, গ্রাম-শহর আবহমান কাল ধরে প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি করে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠলেও কালের যাত্রায় প্রকৃতিকে নিয়ে জীবনযাপন করা এখানকার অধিবাসীরা যেমন হারিয়ে গেছে, তেমনি বিনষ্ট হয়েছে প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ। বৃক্ষরাজি সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশ নির্মল রাখে এবং বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে গ্রিনহাউস গ্যাসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমায়। গাছপালা বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের আধিক্য ঘটায় বলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ে। যেসব এলাকায় গাছপালা কম সেখানে মরুকরণ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। গাছপালা মাটিতে জৈব পদার্থের সংযোজন করে মাটির উর্বরতা বাড়ায় এবং প্রাণিজগতের খাদ্য শিকলের ভারসাম্য রক্ষা করে। বড় বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, সিডর-এর প্রলয়ংকারী আঘাত প্রাথমিকভাবে বন বা দেশের বনাঞ্চল প্রতিহত করে। কিন্তু ১৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ আজ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা, দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের প্রস্তুতির বিকল্প নেই, এ বিষয়টি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেশ পূর্বেই অনুধাবন করেন। *কারাগারের রোজনামচা* বইয়ে দেখা যায়, ১৭ই জুলাই ১৯৬৬ সালের ঘটনায় বঙ্গবন্ধু লেখেন, "বাদলা ঘাসগুলো আমার দূর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না। আমিও নাছোড়বান্দা।" তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সময়কালে ভূমি, মাটি, পানি, মৎস্য এবং বন সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে শুধু জীবন ও সম্পদই নষ্ট হয় নি, দেশের বৃক্ষ ও বনাঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা থেকে উত্তরণের জন্য, দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা বজায় রাখতে ও দেশকে বৃক্ষসম্পদে আরো সমৃদ্ধ করতে

[১]উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান কার্যক্রম চালু করেন। তিনি ১৯৭২ সালে রমনা মাঠে (রেসকোর্স ময়দান) ঘোড়দৌড়ের মাধ্যমে জুয়াখেলা বন্ধ করে নারকেলের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে একটি উদ্যান তৈরির প্রচেষ্টাকে উদ্বোধন করেন। তিনি উদ্যানটির নামকরণ করেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। তাঁর রোপিত নারকেল বীথির পাতায় পাতায় খেলা করে গ্রীষ্মের আলুথালু বাতাস, জ্যোৎস্নারাতে রুপালি আলোয় ঝলমল করে হেসে ওঠে, আবার বিকেলের সোনারোদ পিছলে যেতে যেতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এখন নগরীর কোটি কোটি মানুষের ফুসফুস সচল রাখার গুরু দায়িত্ব পালন করছে। আমরা এখন যা কেবল ভাবতে শুরু করেছি, তিনি ভেবেছিলেন আরো চল্লিশ বছর আগে।

সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পথের পাশে, মহাসড়কের ধারে, বাড়ির আনাচে-কানাচে ও পতিত স্থানে ফলদ বৃক্ষরোপণের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে বৃক্ষপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণভবন, বঙ্গভবনে গাছ লাগিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষ্যে দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী প্রদান করেন :

"বনাঞ্চলগুলোতে সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন ও অধিক উৎপাদনশীল করার জন্য সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারি বনাঞ্চল-বহির্ভূত এলাকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় অধিক গাছ লাগিয়ে বৃক্ষসম্পদ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১লা জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এই বৃক্ষরোপণ অভিযানের সময় এবং পরে অধিক বৃক্ষরোপণ করে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা। কেননা, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া মুষ্টিমেয় সরকারি কর্মচারীর পক্ষে এ বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আমি দেশের জনপ্রতিনিধি, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, সমাজসেবী ও আপামর সাধারণের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিজেদের এলাকায়-স্কুল, কলেজ, কলকারখানা, রাস্তাঘাট এবং বাড়িঘরের আশপাশে যেখানেই সম্ভব মূল্যবান গাছ লাগিয়ে এবং তার পরিচর্যা করে সরকারের এ প্রচেষ্টাকে সফল করে।' এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ উপ-কমিটি কর্তৃক "সবুজ পরিবেশ আন্দোলন" দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছে। আওয়ামী লীগ কর্তৃক ইতোমধ্যে ১ কোটি ফলদ, বনজ ও ওষুধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষকলীগ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র এই তিন মাসে সমগ্র দেশে ফলজ, বনজ ও ভেষজ এ তিন প্রজাতির গাছ রোপণের কর্মসূচি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে। বাংলাদেশ বনজসম্পদ সমীক্ষা (BFI) প্রতিবেদন মতে বর্তমানে দেশের মাটির উপরের বৃক্ষসম্পদ, মাটির নিচের বৃক্ষসম্পদ এবং মাটির মধ্যে (৩০ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ ১২৭৬ মিলিয়ন টন।"

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য গত দুই দশকে বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্তঃসংযোগ স্বীকার করে সে মতে পরিকল্পনা প্রণয়ন কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো দূরদর্শী নেতার পক্ষেই সম্ভব। উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ মোকাবিলায় "Nature based Solution" এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব এ ধারণা থেকেই স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল রক্ষাকারী বাঁউবেস্টনী সৃষ্টি করেছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বলেন,

"প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে যেসব দেশ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ব সমাজের দ্রুত এগিয়ে আসার উপযোগী একটি নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠনে বাংলাদেশের বিশেষ স্বার্থ নিহিত রয়েছে।"

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর পরিবেশের সুস্থতায় সুন্দরবনের তাৎপর্য অনুধাবন করে সুন্দরবন সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য তিনি জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ কর্মসূচি উদ্বোধনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা গাছ লাগাইয়া সুন্দরবন পয়দা করি নাই, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি এটাকে করে দিয়েছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য, বঙ্গোপসাগরের পাশ দিয়া যে সুন্দরবনটা রয়েছে, এটা হলো বেরিয়ার, এটা যদি রক্ষা করা না হয়, তাহলে একদিন খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লার কিছু অংশ, ঢাকার কিছু অংশ পর্যন্ত এরিয়া সমুদ্রে তলিয়া যাবে এবং হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মতো আইল্যান্ড হয়ে যাবে। একবার সুন্দরবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সমুদ্র যে ভাঙন সৃষ্টি করবে সেই ভাঙন থেকে রক্ষা করার কোন উপায় আর নাই।"[৮] বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই উপকূলীয় অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন সূচনা করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে এখন বাংলাদেশের বিশাল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত পেয়েছে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তাইতো তিনি বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, ফিদেল কাস্ত্রোর ভাষায় হিমালয়সম।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নেতৃত্বের গুণাবলি ধারণ করে তাঁর কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই নিশ্চিত করছেন। বাংলাদেশের প্লাবন ভূমি মূলত বদ্বীপ আকৃতির পলিঘটিত সমভূমি যা পাললিক ও সামুদ্রিক উপাদান থেকে গড়ে উঠেছে। ভূমির নিম্ন উচ্চতা ও বন্ধুরতার কারণে পানি অত্যন্ত ধীরে গড়ায় এবং নদ-নদীগুলির সর্পিলপথে এঁকেবেঁকে চলার প্রবণতা থাকে। ভাঙাগড়া ও বারবার বন্যা বা বিভিন্ন ধরনের প্লাবন দ্বারা নবগঠিত ভূমি গড়ে উঠছে এবং অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় শেখ হাসিনা সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে "বাংলাদেশ কার্বন বাজেটিং": "কার্বনবিহীন উৎপাদন পথ" এবং "নিম্ন কার্বন শিল্পায়ন" এর মতো বিশেষ পরিকল্পনাসহ জলবায়ু ও দুর্যোগ সৃষ্টে বহুমাত্রিক ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে "বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" গ্রহণ করা হয়েছে। বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০ পরবর্তী ১০০ বছরের টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশকে পথ দেখাবে, জিডিপির এক ভাগের বেশি জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ব্যয় করা হয়। "সুন্দরবন" সংরক্ষণের ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে (Department mission of the People's Republic of Bangladesh to the United Nations)। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই এ বিষয়ক একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। তাঁর দূরদর্শী দিকনির্দেশনায়, পরিকল্পনা কমিশনের সহযোগিতায় এবং দেশের ১৪টি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বা বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০ গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রকাশিত হয়।

বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০টি মূলত অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নে পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ, প্রতিবেশগত ভারসাম্য, কৃষি, ভূমি ব্যবহার, এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি অভিযোজনভিত্তিক, সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত মহাপরিকল্পনা। শতবর্ষের মহাপরিকল্পনাটি বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় করবে। বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০-এর বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটা একইসঙ্গে টেকনিক্যাল, সোর্সিও-পলিটিক্যাল ও ইকোলজিক্যাল ভাবনার সমন্বিত দলিল। বদ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০-এ বলা হয়েছে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা (২০৫০ সালের মধ্যে তাপমাত্রার বৃদ্ধির সম্ভবনা ১.৪-১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টিপাতের তারতম্য (সামগ্রিকভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে বৃষ্টিপাত বাড়বে, তবে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে কমার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি (দেশের প্রায় ৭০ ভাগ অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক মিটার উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত। প্রতিবছর নদী ভাঙনে প্রায় ৫০ হাজার বসতি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং

দেশের অভ্যন্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ২০৫০ সাল নাগাদ উচ্চতা ০.২–১.০ মিটার বৃদ্ধি পেতে পারে। লবণাক্ততা ১৭.৫ শতাংশ এলাকায় এক পিপিটি এবং ২৪ শতাংশ এলাকায় পাঁচ পিপিটি বৃদ্ধি পেতে পারে।

বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত করণীয়

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-তে দেশের আটটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে একই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন জেলাগুলোকে একেকটি গ্রুপের আওতায় আনা হয়েছে। যাকে হটস্পট (পানি ও জলবায়ু উদ্ভূত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হটস্পটগুলো হলো উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রধান অঞ্চল, হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী অঞ্চল

ও মোহনা এবং নগরাঞ্চল। মূল কথা হচ্ছে যেসব এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব খুব প্রকট সেসব হটস্পটে যে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেগুলো মোকাবিলা করার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তথা ডেল্টা প্ল্যানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক বিকাশ আর উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এগিয়ে চলা বাংলাদেশেও কার্বন নিঃসরণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে সবচেয়ে কার্যকরী প্রশমন (Mitigation) ব্যবস্থার বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ধীর করতে কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাসে সক্ষম হবে। সেক্ষেত্রে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে অপক্ষোকৃত নিম্নস্তরে রাখার জন্য প্রশমন ব্যবস্থার পাশাপাশি অভিযোজন (Adaptation) পদক্ষেপে নেয়াও প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ধীর করতে কিংবা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাসে সবুজ প্রযুক্তিভিত্তিক ভবনের আন্দোলনের বয়স প্রায় দুই দশক। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভবনের বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি স্বেচ্ছা-উদ্যোগে সবুজ ভবন রেটিং পদ্ধতির প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। যেটির আওতায় কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভবনগুলো শ্রেণিকরণ করা হবে এবং এ মূল্যায়নে যেসব স্থাপনা পরিবেশগত দিক দিয়ে ভালো বলে বিবেচিত হবে, সেগুলোকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেয়া হবে। এ-জাতীয় রেটিং কর্মসূচি ভবনের পরিবেশগত প্রভাবকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করার লক্ষ্যে দ্রুতসই নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ এবং পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা দেবে। টেকসই ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক সম্পদ ভাগাভাগি, মান প্রণয়ন ও পেশাগত স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি চালু করা হবে। ভূমির অবক্ষয় ও দূষণের একটি প্রধান খাত গতানুগতিক ইটভাটা। ইটভাটাগুলোয় সাধারণত আবাদি জমির উপরিভাগের মাটি (টপ সয়েল) ব্যবহার করা হয়। ফলে আবাদি জমির তিন-চতুর্থাংশ উর্বরতা হ্রাস পায়। এছাড়া যে প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে ইট উৎপাদন করা হয়, তাতে বিপুল পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদানের নিঃসরণ ঘটে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ইট প্রস্তুতকরণে সবুজ পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উভয়ক্ষেত্রে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে অনুশাসনগুলো হলো–

- ঢাকায় সবুজ এলাকা (পার্ক, খেলার মাঠ প্রভৃতি) বেষ্টনী (প্রতি ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বর্গকিলোমিটার এ উন্নীতকরণ)।
- অন্য সাতটি প্রধান শহরে সবুজ এলাকার আওতা প্রতি ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে ১.৫ থেকে ২.৫ বর্গকিলোমিটার এ উন্নীতকরণ।
- পানির মান শতভাগ অক্ষত রেখে শহরের জলাশয়সমূহ সংরক্ষণ।
- যথাযথ নর্দমা ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যামুক্ত হওয়া শহরের সংখ্যা ২ থেকে ১০ এ উন্নীতকরণ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গিকার বাস্তবায়নে নানামুখী কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রচলিত ইট-ভাটাগুলোতে জ্বালানি হিসেবে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ কাঠই পোড়ানো হয় না, সেখানে ব্যবহৃত কয়লা থেকে নির্গত হচ্ছে, ধূলিকণা, পার্টিকুলেট কার্বন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইডের মতো ক্ষতিকারক নানান গ্যাস। ড্রেজিং সয়েলের সাথে ১০% সিমেন্ট মিশিয়ে চাপ প্রয়োগের (compression) মাধ্যমে Compressed Stabilized Earth Block (CSEB) তৈরি করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন নানা প্রকল্পে প্রচলিত ইটের বদলে পরিবেশবান্ধব ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। নির্মাণ শিল্পের অন্যতম সামগ্রী এমএস রড তৈরিতে ব্লাস্ট ফার্নেসের পরিবর্তে ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে এ শিল্প থেকে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমে আসতে শুরু করেছে। একইভাবে কাচের ক্ষেত্রেও পরিবেশের ক্ষতি কম করে এমন লো এমিশন-গ্লাস এবং ডাবল গ্লেজিং গ্লাসের প্রচলন শুরু হয়েছে।

শুধু নির্মাণ উপকরণে নয়, কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভবন নির্মাণের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাইলিং-এর জন্য প্রচলিত ড্রপ হ্যামার বা ডিজেল হ্যামারের বদলে হাইড্রোলিক পুশ হ্যামার ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে বন্ধ হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতিকারক কালো ধোঁয়া। ব্রিক চিপসের বদলে ঢালাইয়ে স্টোন চিপস বাধ্যতামূলক করা, হচ্ছে ফলে পোড়া ইটের ব্যবহার অনেকখানি কমিয়ে আনা হচ্ছে যা একদিন বন্ধ করবে ইটভাটার অস্বাভাবিক কার্বন নিঃসরণ। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কারে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে রেট্রোফিটিংকে। পুরাতন ভবনের স্থায়িত্বকাল বাড়িয়ে নতুন ভবন নির্মাণ কিছুটা কমালে তার সাথে সাথে কমবে এর সাথে জড়িত সকল নির্মাণ উপাদানের সময় নিঃসরিত কার্বন।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর সেন্সর বোর্ড কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ খরচ যেমন কমে এসেছে তেমনি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনও হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে সূর্যের আলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আর সে কারণেই সোলার প্যানেলের দেখা মেলে এখন প্রায় সব প্রকল্পে। ভবনের তাপ কমানোর জন্য, বাতাস প্রবাহের ক্ষেত্রে শেডিং ডিভাইস কাজে লাগানো হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও শোধনাগার নির্মাণ করা হচ্ছে। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদনকারী সেপটিক ট্যাংক আর সোক-ওয়েলের বদল সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যম বর্জ্য পরিশোধন করায় কমে এসেছে পরিবেশ দূষণ।

সরকারের প্রতিটি প্রকল্পেই সবুজায়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সংরক্ষণ করা হচ্ছে উন্মুক্ত খেলার মাঠ বা সবুজ উদ্যান। তবে শুধু খোলা জায়গায়ই নয়, সবুজ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ভবনেও, ছাদ বাগান কিংবা দেয়ালে। মাটির প্রকৃতির যেন পরিবর্তন না হয়, সেজন্য ভবনের বাইরের উন্মুক্ত স্থানকে প্রয়োজন ছাড়া পাকা করা হচ্ছে না।

নগর অঞ্চল হটস্পট

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মোতাবেক জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নগরসমূহর ভূমিকা বিবেচনায় নগরায়ণ বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশব্দে রূপ নিয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন গবেষণায় বিশ্বের জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ৭০%-এর জন্য নগরগুলোকে দায়ী করা হয়।[৩] বাংলাদেশের নগরগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে দুটি মৌলিক কারণে। প্রথমত, নগরগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন; ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন এবং বন উজাড়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। দ্বিতীয়ত, আগামী দুই দশকের ভিতরেই বাংলাদেশের নগরায়িত এলাকার লোক সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক সেক্ষেত্রে নগরসমূহ সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তবে নগরীর পরিবেশগত সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল, বহুমাত্রিক এবং একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

অনুসারে নগরাঞ্চলের জন্য ৫টি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ভূমি ক্ষয় ও বন্যা, স্বাদু পানির পর্যাপ্ততা, পরিবেশের অবনমন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে নগরাঞ্চলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশল-

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০

নগর অঞ্চল হটস্পট জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবসমূহের বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে নগরাঞ্চলের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কৌশল ৭টি জেলা ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট-এর মোট ১৯,৮২৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত–

(ক) সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি এবং সাইক্লোনের প্রকোপ বৃদ্ধি।

(খ) চরম আবহাওয়া ও নগর বন্যা।

(গ) উদ্বাস্তুন।

(ঘ) বায়ু দূষণ।

(ঙ) সুপেয় পানির অভাব ও জলদূষণ।

কৌশল-১: পানি নিষ্কাশন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নগর এলাকার জলাবদ্ধতার ঝুঁকি হ্রাসে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা, বিদ্যমান পয়ঃনিষ্কাশন কাঠামোর উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্রাকৃতিক জলাধারকে সম্পৃক্ত করে পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রাকৃতিক খাল ও জলাধারগুলো পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ, পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ভূগর্ভস্থ জলাশয়ে সংরক্ষণ এবং বিতরণকরণের মাধ্যমে ধোয়া-মোছার কাজে ব্যবহার এবং পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণ করতে হবে।

কৌশল-২: নগরাঞ্চলে পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো সংরক্ষণ এবং অবৈধ দখলের হাত থেকে রক্ষা করা এবং নগরে কৌশলগতভাবে বনায়ন ও জলাধারা তৈরি করতে হবে।

কৌশল-৩: সমন্বিত নগর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য ৬৪ জেলায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্মাণ উপকরণ ও নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণার পরিচালনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আলাদা আলাদা কর্তৃপক্ষ রয়েছে। পাশাপাশি গণপূর্ত অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও নগর অঞ্চল পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও এ এলাকাগুলোতে তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে।

বদ্বীপ পরিকল্পনায় নগর অঞ্চল এলাকায় প্রধানত দুটি দুর্যোগ ঝুঁকিকে : ভূমিকম্প ও জলাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা ও ভূমিকম্প, নদীভাঙন, বজ্রপাত থেকে অবকাঠামোগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড ২০২০ প্রণয়ন করেছে। এই কোডে ৪টি ভূমিকম্প জোনকে চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে জোন ৪ অধিক ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের বিপদাপন্ন তিনটি প্রধান শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষসমূহ Microzonation Map অনুসারে ভবন নির্মাণের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি আরো ৬টি প্রধান শহর যেমন– রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী এবং ময়মনসিংহে ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপণে প্রণীত Risk Atlas অনুসরণ করা প্রয়োজন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনায় Active fault map অনুসারে বা স্তরচ্যুতি (fault) শনাক্ত করা প্রয়োজন। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার ও সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য উন্মুক্ত স্থানের সংরক্ষণ এর বিষয়টি নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

নগর বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ জলাবদ্ধতা। একটি শহরে ২০-২৫ শতাংশ সবুজ এলাকা এবং ১০-১৫ শতাংশ জলাশয় থাকা প্রয়োজন। যা শহরের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গে পানি নিষ্কাশন এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণে সহায়তা করে। নগর পরিকল্পনায় সবুজ এলাকা, খোলা জায়গা কিংবা পার্ক উদ্যানগুলো বৃষ্টির পানিকে মাটিতে পুনর্ভরণের মাধ্যমে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনায় অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নগরায়ণের চাপে শহরের খালগুলো ক্রমান্বয়ে দখলের শিকার হওয়ায় এর প্রশস্ততা কমে গিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা (নেটওয়ার্কের হিসেবে নগরের খালগুলো) কার্যকারিতা হারাচ্ছে। নগর এলাকা ধূসর বা কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৩০-৫০% হলে ভূপৃষ্ঠের পানি প্রবাহ (সারফেস রান অফ) বৃষ্টিপাতের ৩০-৫০% হয় অর্থাৎ পুরোটাই। কিন্তু, কংক্রিট আচ্ছাদনের পরিমাণ ৭৫% শতাংশ হলে ভূপৃষ্ঠে পানি প্রবাহের পরিমাণ ৬০% বেশি হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্সের (BIP) ২০১৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকার মূল শহর এলাকায় কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকা ৮০% শতাংশের ওপরে, যেখানে জলাশয় ৫ শতাংশ ও সবুজ আচ্ছাদিত মাত্র ১০ শতাংশ। ফলে ঢাকা শহরে কংক্রিট আচ্ছাদিত এলাকা বেশি হওয়ার কারণে বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে পুনর্ভরণের সুযোগ তুলনামূলকভাবে অনেক কম হওয়া শহরে অল্প বৃষ্টিতে অনেক এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসারে অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কিংবা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ প্রকল্প এলাকায় দুই তৃতীয়াংশ খোলা জায়গা রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নে এ নির্দেশনা অনুসরণ করছে। এতে প্রকল্প এলাকায় সবুজায়নের পাশাপাশি জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পসমূহের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা এবং অন্যান্য পরিকল্পনায় জলাভূমি, প্লাবন ভূমি সংরক্ষণের বিষয়ে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। জলাশয় অধিগ্রহণের মাধ্যমে কিংবা উন্নয়ন স্বত্ব প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষসমূহকে উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কক্সবাজার শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী লালদিঘী, গোলদিঘী ও বাজার ঘাটা পুকুর তিনটি সংস্কার করেছে। এতে একাধারে শহরের ঐতিহ্য সংরক্ষণ নাগরিক সুবিধা প্রদান ও জলাবদ্ধতার অবসান ঘটিয়ে নগর বন্যার সম্ভাবনা হ্রাস করেছে। অন্যান্য সংস্থা কিংবা কর্তৃপক্ষসমূহ এ উদাহরণকে কাজে লাগাতে পারে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকল্পসমূহের ভীত উঁচুকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ডিপিপি/টিএপিপিতে দুর্যোগ ঝুঁকি পরিমাপে Disaster Impact Assesment (DIA) টুলস ব্যবহার নিশ্চিতকরণ করাও অত্যাবশ্যক। বন্যা মোকাবিলা কৌশল বাস্তবায়নে GIS/Remote Sensing ও স্থানিক মানচিত্র সমন্বয় করে নিমজ্জন মাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দুর্যোগ পুনরুদ্ধার পর্যায়ে Build Back Better পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

নগর এলাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যোগসূত্র রয়েছে। International Energy Agency-এর মতে পরিকল্পিত শহরগুলো তাদের এনার্জি হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ২৫% কমিয়ে আনতে সক্ষম। এক্ষেত্রে বদ্বীপ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্যে "Nature based Solution"-এর মাধ্যমে এ হ্রাস সম্ভব। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে শুধু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্যানই নয়, স্থাপন করা হয়েছে ইনভার্টারযুক্ত এয়ারকুলার, যেগুলোতে সিএফসি মুক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ভবনের পানির পাম্পে যুক্ত করা হয়েছে সেন্সর, যাতে বিদ্যুতের অপচয় ঠেকানো যায়। স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল কার পার্কিং ব্যবস্থা।

উদাহরণস্বরূপ স্টকহোম থেকে টোকিও সকল শহরই নানারূপ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ ২০১০ সালের স্বাভাবিকের চেয়ে অত্যধিক উষ্ণতার মৌসুমের পর ভারতের আমেদাবাদ শহরে তাদের "Heat Action Plan"-এর প্রচলন ঘটে। এ পরিকল্পনায় শহরটি উষ্ণায়নের জন্য পূর্বাভাসের প্রচলনের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ ও "উন্মুক্ত ছাদ" কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রায় ৭০০০ স্বল্পমানের গৃহের ছাদ এ কর্মসূচির মাধ্যমে সাদা রং করা হয়। এতে নাটকীয়ভাবে গৃহের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমে যায়। পরীক্ষার দেখা গেছে এক রৌদকজ্জোল দিনে সাদা ছাদ প্রায় ৮০% সৌরালোকে প্রতিফলিত করে সাধারণ ছাদের তাপমাত্রাকে যেখানে ২০% বিকিরণ করতে সক্ষম (UNEP 2020) এ ধরনের গৃহের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা প্রায় ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হ্রাস করতে সক্ষম। এ স্বকীয় উদ্ভাবনের জন্য আহমেদাবাদ শহর "2020 Ashder Award for Cool Cities" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। মেলবোর্ন শহরে "Urban Forest" ধারণার প্রচলন ঘটিয়ে বায়ুদূষণ হ্রাস এবং যান্ত্রিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে ইতালির মিলান শহরে "Foresta" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০,০০,০০০ বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আশা করা যায়, এতে শহরের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পাবে। মরুকরণ ঠেকানো কিংবা উষ্ণায়ন হ্রাসের জন্য সিয়েরা লিওনের রাজধানী ফ্রিটাউনেও প্রায় ১,০.০০.০০০ বৃক্ষরোপণের এবং শহরে সবুজায়নের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। "Green Living room" ধারণা প্রচলনের মাধ্যমে ফ্রাঙ্কফুট শহর প্রাকৃতিকভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হটস্পট

দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম উপাদান পাহাড়ের টিলা কেটে বিভিন্ন স্থানে বসতবাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। যেমন ২০০৩ থেকে ২০২০ সালের জুলাই পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরীতে ১২৩টি পাহাড় কাটা হয়েছে। শুধু কক্সবাজারের চুনতি বনভূমি এলাকায় ১৫ থেকে ২০টি পাহাড় থেকে ২ কোটি ঘনফুট মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। পাহাড় কাটার কারণে পাহাড়ধস বাড়ছে। ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয় অঞ্চলে তীব্র পানি সংকট হার ক্রমেই বাড়ছে। হিমালয় অঞ্চলের ৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই প্রতিবেদনে সংকট নিরসনে পার্বত্য এলাকায় নগরায়ণের বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়েছে।

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল" হটস্পটের আয়তন ১৩ হাজার ২৯৫ বর্গকিলোমিটার আওতাভুক্ত তিন জেলা কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি নিয়ে গঠিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল" হটস্পটের ৫টি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- স্বাদু পানির স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পরিবেশের অবনমন এবং ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধসের সাথে উপকূলীয় সমতল বিবেচনাগ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। পাহাড় এবং সংলগ্ন উপকূলীয় সমভূমি উভয়দিক বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর অন্যতম প্রধান প্রাধিকারভুক্ত বিষয় হলো বাস্তুতন্ত্রের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে পার্বত্য অঞ্চলের বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা ।

নদী এবং মোহনা অঞ্চল হটস্পট

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে ২৯টি জেলা নিয়ে নদী অঞ্চল এবং মোহনার আয়তন ৩৫ হাজার ২০৪ বর্গকিলোমিটার। জেলাগুলো হচ্ছে- বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ফেনী, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লক্ষীপুর, লালমনিরহাট, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নাটোর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, পাবনা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও খুলনা। নদী এবং মোহনা অঞ্চলের ৫টি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– বন্যা, পানি দূষিত হওয়া, পরিবেশের অবনমন, পলি ব্যবস্থাপনা ও নৌ-পরিবহণ এবং নদীগর্ভের পরিবর্তন-ভাঙন ও নতুন চর।

বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল হটস্পট

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ এলাকার আয়তন ২২ হাজার ৮৪৮ বর্গকিলোমিটার। এর আওতায় ১৮টি জেলা–বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নওগাঁ নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, পাবনা, পঞ্চগড়, রাজশাহী, রংপুর, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ ও ঠাকুরগাঁও। বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য চিহ্নিত ৫টি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– স্বাদু পানির প্রাপ্যতা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিবেশের অবনমন। রাজশাহী অঞ্চলটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল হটস্পট

দেশের মোট আয়তনের ৭০ শতাংশই জলাভূমি। তবে বেশির ভাগ নদী ও জলাভূমি সুরক্ষিত নয়। আজ অপরিকল্পিত নানা 'উন্নয়ন' কর্মকাণ্ডে এখন প্রায় এক হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক জলাশয় চলনবিলের অস্তিত্বই বিপন্ন। বিলটি এখন মাত্র প্রায় দুইশ' বর্গকিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের আয়তন ১৬ হাজার ৫৭৪ বর্গকিলোমিটার। আওতাভুক্ত জেলা ৭টি– ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট। হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের জন্য চিহ্নিত ৫টি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– স্বাদু পানির প্রাপ্যতা, আকস্মিক বা মৌসুমি বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন, অপর্যাপ্ত পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিবেশের অবনমন।

উপকূলীয় অঞ্চল হটস্পট

দেশের শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ যেমন এ উপকূল অঞ্চলে বসবাস করে, তেমনি জাতীয় অর্থনীতিতে জিডিপির কমবেশি প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ অবদানও এ অঞ্চলেরই। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল খুবই নাজুক পরিবেশীয় অবস্থায় রয়েছে। ব্যাপক প্রাকৃতিক ও চাষাবাদ প্রক্রিয়ার প্রভাবে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় এই উপকূলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটাই বদলে গেছে। ফলে ভূমিক্ষয় ও পলি জমা হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমির গঠন পাল্টে যাচ্ছে। নদী ভাঙন, নতুন নতুন চর জেগে ওঠা এবং ফলশ্রুতিতে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন থেকে তা লক্ষ্য করা যায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতিসহ চরম অবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে উজান থেকে আসা উচ্চ প্রবাহের সঙ্গে বিপুল পলি, বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী প্রবল জোয়ার-ভাটা ও বর্ষাকালের প্রবল পানিপ্রবাহ। বিগত ২০০ বছরেরও অধিক সময়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপসমূহের জেগে ওঠার ফলে মোহনার পরিবর্তন হয়েছে। নদীখাতের স্থান বদল ও দক্ষিণে কতক দ্বীপের উদ্ভব ঘটেছে। পরিবেশ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে প্রবল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। অধিকন্তু, উপকূলে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম এক অনন্য বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এ অঞ্চল উন্নয়নে মানুষের প্রয়াস অত্যন্ত সংবেদনশীল ও নাজুক বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

বদ্বীপ এলাকার উপকূলীয় শহরগুলো ও দ্বীপগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন হয়।[৩] জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় অঞ্চল মারাত্মক ভঙ্গুরতার শিকার। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলের একটি বিরাট অংশ বঙ্গোপসাগর গ্রাস করে ফেলবে। তাছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির নিচের মিঠাপানির জলাধার স্তর ক্রমাগত লবণাক্ত হবে এবং একটি বিশাল উপকূলীয় জনগোষ্ঠী তাদের বাসভূমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয়কে রৈখিকভাবে প্রাধান্য না দিয়ে এর সাথে দেশের সামগ্রিক নগরায়ন প্রক্রিয়াকে সংযুক্ত করতে হবে।

বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ অনুসারে উপকূলীয় অঞ্চলের আয়তন ২৭ হাজার ৭৩৮ বর্গকিলোমিটার। এ অঞ্চলের আওতাভুক্ত জেলা ১৯টি– বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা ও শরীয়তপুর। বদ্বীপ পরিকল্পনা ২০২১ অনুসারে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন এবং তার সাথে জলোচ্ছ্বাস এবং ক্রমাগত নগর বন্যায় উপকূলীয় বদ্বীপ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ভবিষ্যতে উপকূলীয় নগরসমূহে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চল গৃহীত প্রকল্পসমূহে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাদু পানি সরবরাহ বৃদ্ধিক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ, সমুদ্রে নতুন জমি পুনরুদ্ধার এবং সুন্দরবন সংরক্ষণের বিষয়ে দৃষ্টি আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে নিম্নের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা যায়–

১) সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনশীল ভূমির ব্যবহার, অবকাঠামো ও নগরায়ণের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা গ্রহণ;

২) স্থানিক পরিকল্পনা মোতাবেক বিপর্যয় অনুসারে অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস। ঝুঁকি মানচিত্র অনুসারে প্রকল্প গ্রহণ;

৩) অধিক্ষেত্র কেন্দ্রিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে বিদ্যমান ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস;

৪) ভবিষ্যত সহজাতভাবে অনিশ্চিত তাই মাত্রাতিরিক্ত অবকাঠামো নির্মাণে পরবর্তী সময়ে তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে সম্পদের অপচয় করবে;

৫) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমীক্ষা সম্ভাব্যতা যাচাই, Disaster Impact Assesment (DIA) ইত্যাদির সার্বিক প্রয়োগ;

৬) বহুমুখী (ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) আশ্রয়কেন্দ্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদারকি ও মূল্যায়ন করা;

৭) পানি নিষ্কাশন সক্ষমতা বাড়ানো ও নগর এলাকায় বন্যার ঝুঁকি কমানো স্থানীয় পর্যায়ের বিদ্যমান জলাধার (খাল, পুকুর, হাওড়), পুনঃখনন এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে পানি সংরক্ষণ এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;

৮) পানি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ এবং সংরক্ষণ;

৯) নগর নদীতে স্বাদু পানি প্রবাহ বৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখা

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২০-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত 'Building Vulnerability Assessment for Earthquake Preparedness in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি-কে সম্মাননা স্মারক প্রদান

মুজিববর্ষের উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি পরিদর্শনে

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান ফটকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপনা উন্মোচন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজধানীর মিরপুরে বস্তিবাসীদের জন্য নির্মাণাধীন ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাটের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাস্তবায়িত ৫টি আবাসন প্রকল্প ও মাদারীপুরে সমন্বিত অফিস ভবন এবং বস্তিবাসীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক ৩০০টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ ও কার্বনমুক্ত নগরায়ণ : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া*

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিল, প্রতিবছরের অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হবে এ বছর এরই প্রেক্ষিতে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে অক্টোবর মাসের ৪ তারিখে। । বিশ্বের সকল দেশের জন্য এ দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বজুড়ে আমাদের নগর ও শহরগুলোর ধারাবাহিক অগ্রগতিতে সকলের জন্য পরিবেশসম্মত যথাযথ বাসপোযোগিতা, মৌলিক সেবাসমূহসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে প্রতিফলন ঘটানো করা। তবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে নগরগুলোতে যেমন নগর ও নাগরিকের উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তেমনি থেমে নেই এর বিপরীত চিত্রও। ফলশ্রুতিতে নগরের উন্নয়নের পাশাপাশি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নগরসমূহে গড়ে উঠছে এক বৈপরিত্যময় আর্থসামাজিক পরিবেশ এবং পরিবেশ বিধ্বংসী নানা কার্যক্রম। তাই এ কথা নিশ্চিততাবেই বলা যায়, সকলের জন্য নিরাপদ, পরিবেশসম্মত, বাসযোগ্য ও টেকসই নগর তৈরির প্রক্রিয়ায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নগরগুলোর সামর্থ্য আর প্রচেষ্টা সমন্বিতভাবে এখনো খুব একটা ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি এখনো। নগরগুলোর মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং জাতিসংঘ ঘোষিত ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক পালিত প্রতিবছরের আরবান অক্টোবর সমতাভিত্তিক বৈশ্বিক নগর তৈরিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও বিশ্বের অনেক নগরই এখনো নাগরিকদের জন্য সত্যিকারের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারে নি। বরং নানারকম বৈষম্য নগর ও নাগরিক জীবনকে ক্রমশই ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

নগরের সূত্রপাত এবং নগর ব্যবস্থার বিকাশ মানবসভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ একটি অধ্যায়। নগরায়ণ ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক এবং এদের ধনাত্মক প্রভাব সর্বত্র স্বীকৃত। বিশ্বায়নের প্রভাবসহ নানা কারণে মানুষ আজ নগরমুখী, ফলে বাড়ছে নগরায়ণ। নগরসমূহে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি নানারকম চাহিদার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে, বিশেষত নগরের প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসসমূহে। বলা বাহুল্য প্রকৃতিনির্ভর কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে উৎপাদন নির্ভর নগর সমাজ ব্যবস্থা মানবগোষ্ঠীকে একদিকে যেমন দিয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি অন্যদিকে সৃষ্টি করেছে নানাবিধ পারিবেশিক বিপর্যয়। প্রকৃতির এ বিরূপ প্রভাব আজ ভাবিয়ে তুলেছে বিশ্ববাসীকে। তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জাতিসংঘ ঘোষিত এ বছরের (২০২১) বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যে "Accelerating Urban Action for a Carbon-free World"। বিশ্বজুড়ে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন যৌগের ব্যবহার, বৃক্ষনিধন, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ মানবসৃষ্ট নানাবিধ কারণে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ সুস্পষ্ট। সুতরাং নগরের বাসযোগ্যতা এবং পরিবেশ সুরক্ষা আজ সময়ের দাবি। এ প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে বাষ্প (H_2O), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), মিথেন (CH_4), ওজন (O_3), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC)-কে গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে পরিগণিত করা হয়। বায়ুমণ্ডলে এই গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সূর্য থেকে প্রাপ্ত সৌরশক্তির সম্পূর্ণ অংশ মহাশূন্যে ফেরত যেতে না পেরে ভূপৃষ্ঠকে ক্রমশ উত্তপ্ত করে তুলছে। আমরা জানি,

---

* যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) এবং সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় আমাদের নগরসমূহের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রক্রিয়াটিকে মানবসৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ অধিক জন ঘনত্বপূর্ণ নগরের অধিবাসীরা নানারকম সুখ-সমৃদ্ধি উপভোগের জন্য যেসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশের ওপর বহুবিধ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এরই ফলশ্রুতিতে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বের নগরসমূহ ভূপৃষ্ঠের মাত্র ২ শতাংশ জায়গাজুড়ে বিস্তৃত, তবে এই সীমিত পরিসরে বিস্তৃত নগরসমূহ হতেই উৎপন্ন হচ্ছে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রায় ৭০ শতাংশ (ইসলাম, ২০১১[৩])। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের মোট ব্যবহৃত শক্তির ৭৫ শতাংশই ভোগ করছে নগরের অধিবাসীরা, যার মাধ্যমে নির্গমন হচ্ছে বিশ্বের মোট উৎপন্নকৃত গ্রিনহাউস গ্যাসের ৭০ শতাংশেরও বেশি (UN-HABITAT, 2021)। সুতরাং বিশ্বজুড়ে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির নির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত নগর ও নগরায়ণ আজ নগরের অধিবাসীদের বৈষম্যপূর্ণ, অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিকল্পিত ভোগ বিলাসিতার কারণে সৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন; যা বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করছে। সারণি ১-এ গ্রিনহাউস গ্যাসের একটি পরিবর্তন ধারা উপস্থাপন করা হলো। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১: গ্রিনহাউস গ্যাস পরিবর্তনের ধারা

কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবেও পরিচিত। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী এ উপাদানটি

গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম	শিল্প বিপ্লবের পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	১৯৫০ থেকে বৃদ্ধি
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)	২৮০ পিপিএম	৩৮৮ পিপিএম	১০৮ পিপিএম
মিথেন (CH_4)	৭০০ পিপিবি	১৭৪৫ পিপিবি	১০৪৫ পিপিবি
নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	২৭০ পিপিবি	৩১৪ পিপিবি	৪৪ পিপিবি
ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC)	০	৫৩৩ পিপিটি	৫৩৩ পিপিটি

উৎস: ইসলাম, ২০১১[৩]।

আজ বিশ্ববাসীর উদ্বেগের বিষয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃহৎ আকারের অর্থনীতির দেশগুলোর সাথে এই কার্বন নির্গমন প্রক্রিয়ার একটি ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সীমিত। কার্বন নির্গমন তালিকার শীর্ষে রয়েছে বিশ্বের ৫টি দেশ, এই দেশগুলো যথাক্রমে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্ডিয়া, রাশিয়া এবং জাপান। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীন ২০১৮ সালে ১০.০৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমন করে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে পৌঁছায় এবং চীন ক্রমাগতই এ অবদান বৃদ্ধি করে যাচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে। ২০১৯ সালে চীনের মোট ব্যবহৃত শক্তির ৫৮ শতাংশ এসেছে এককভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি হতে। ২০১৮ সালে ৫.৪১ বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন নির্গমনের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রধান তিনটি খাতকে যথা: পরিবহণ, শিল্প এবং শক্তি উৎপাদন। ২০১৮ সালে ইন্ডিয়া বিশ্বের তৃতীয় কার্বন নির্গমনকারী দেশের তালিকায় স্থান পায়, কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ছিল ২.৬৫ বিলিয়ন মেট্রিক টন। নগরায়ণ ও শিল্পায়ন নির্ভর ইন্ডিয়ার অর্থনীতিতেও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ব্যাপক। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইন্ডিয়ায় ১৯৯২ সালে বিদ্যুতের উৎস হিসেবে কয়লার যে ব্যবহার ছিল ৬৮ শতাংশ, সেটা ২০১৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫ শতাংশে। রাশিয়াকেও বিশ্বের অন্যতম কার্বন নির্গমনকারী দেশ হিসেবে পরিগণিত করা হয়। ২০১৮ সালে ১.৭১ বিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন নির্গমন করে চতুর্থ অবস্থানে ছিল রাশিয়া। রাশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদকারী দেশগুলোর একটি এবং এই প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের শক্তি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক উৎস। রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পকারখানাসহ শক্তি উৎপাদনের জন্য রাশিয়ায় কয়লার ব্যবহার প্রচুর। জাপান বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কার্বন নির্গমনকারী দেশ। ২০১৮ সালে জাপানের কার্বন নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১.১৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন। জাপান দেশের জনগোষ্ঠীদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং শিল্পকারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লার ওপর নির্ভরশীল। ২০১১ সালে ফুকুশিমায় পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ হয়ে যাবার পর জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর জাপানের নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যায়। সারণি ২-এ বিশ্বের দেশগুলোর কার্বন নির্গমনের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২: বিশ্বের দেশসমূহের কার্বন নির্গমনের শতকরা হার

দেশের নাম	কার্বন নির্গমনের শতকরা হার	দেশের নাম	কার্বন নির্গমনের শতকরা হার	দেশের নাম	কার্বন নির্গমনের শতকরা হার
চীন	২৮	ইরান	২	তুরস্ক	১
যুক্তরাষ্ট্র	১৫	সৌদি আরব	২	অস্ট্রেলিয়া	১
ইন্ডিয়া	৭	ইন্দোনেশিয়া	২	যুক্তরাজ্য	১
রাশিয়া	৫	কানাডা	২	পোল্যান্ড	১
জাপান	৩	মেক্সিকো	১	ইতালি	১
জার্মানি	২	দক্ষিণ আফ্রিকা	১	ফ্রান্স	১
দক্ষিণ কোরিয়া	২	ব্রাজিল	১	অবশিষ্ট দেশসমূহ	২১

উৎস : https://www.investopedia.com/articles/investing/092915/5-countries-produce-most-carbon-dioxide-co2.asp

World Data Atlas (https://knoema.com/atlas/Bangladesh/CO2-emissions-per-capita)-এর তথ্য অনুসারে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নির্গমনের পরিমাণ ছিল ০.৬৬ টন এবং দেশে ১৯৭০ থেকে ২০১৯ সময়ে বার্ষিক গড় ৫.৮৮ শতাংশ হারে মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালে মাথাপিছু কার্বন নির্গমন হার ছিল ০.০৫ টন এবং ২০১৬ সালে এ হার ছিল ০.৪৭ টন। সারণি ৩ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এদেশে সীমিত হারে হলেও ধীরে ধীরে মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের হার বেড়ে চলেছে।

সারণি ৩: বাংলাদেশে জীবাশ্ম কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের হার

সাল	জীবাশ্ম CO_2 নির্গমন (টন)	CO_2 নির্গমনের পরিবর্তন (শতকরা)	মাথাপিছু CO_2 নির্গমন (টন)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার পরিবর্তন (শতকরা)	বিশ্বে CO_2 নির্গমনের হার (শতকরা)
২০১৬	৭৪,৪৭৬,২৩০	৪.৫০	০.৪৭	১৫৭,৯৭৭,১৫৩	১.১০	০.২১
২০১৫	৭১,২৬৫,৮৮২	৮.৪১	০.৪৬	১৫৬,২৫৬,২৭৯	১.১৩	০.২০
২০১৪	৬৫,৭৩৫,২৮৫	৩.৩০	০.৪৩	১৫৪,৫১৭,৩৮২	১.১৫	০.১৮
২০১৩	৬৩,৬৩২,৯১৫	৪.৫২	০.৪২	১৫২,৭৬১,৪১৮	১.১৬	০.১৮
২০১২	৬০,৮৮২,১৩০	২.০০	০.৪০	১৫১,০০৫,৭৩৯	১.১৬	০.১৭
২০১১	৫৯,৬৮৩,৯২৪	০.০২	০.৪০	১৪৯,২৭৩,১৩৯	১.১৫	০.১৭
২০১০	৫৯,৬৭৯,০৯০	৯.৩২	০.৪০	১৪৭,৫৭৫,৪৩০	১.১৩	০.১৭
২০০৯	৫৪,৫৮৭,৬১৪	৮.৬৪	০.৩৭	১৪৫,৯২৪,৭৯৭	১.১২	০.১৫
২০০৮	৫০,২৪৫,১১১	১৩.৭২	০.৩৫	১৪৪,৩০৪,১৬৭	১.১৫	০.১৪
২০০৭	৪৪,১৮৪,৯৩৪	৮.৯০	০.৩১	১৪২,৬৬০,৩৭৬	১.১৩	০.১২
২০০৬	৪০,৫৭৩,৩১৩	৫.৯৭	০.২৯	১৪০,৯২১,১৬৭	১.৩৬	০.১১
২০০৫	৩৮,১৮৫,৯১১	৯.৫৬	০.২৮	১৩৯,০৩৫,৫০৫	১.৪০	০.১১
২০০৪	৩৪,৯৪৫,৫২৮	২.৮৫	০.২৬	১৩৬,৯৮৯,৪৩২	১.৩৩	০.১০
২০০৩	৩৩,৯৭৯,১৯৯	৪.৭০	০.২৫	১৩৪,৭৯১,৬০৩	১.৭৫	০.১০
২০০২	৩২,৪৫০,৭২১	৫.৫৯	০.২৪	১৩২,৪৭৮,০৮৩	১.৭৪	০.০৯
২০০১	৩০,৭৩২,৩৬৫	১৭.৬৮	০.২৪	১৩০,০৮৮,৭০২	১.৯০	০.০৯
২০০০	২৬,০৭০,২৬৫	৮.৪৯	০.২০	১২৭,৩৫৭,৮৫৪	১.৯৭	০.০৭
১৯৯৯	২৪,০২৯,৯২৯	৬.৬৮	০.১৯	১২৫,১৮৯,৬৫১	২.০৪	০.০৭
১৯৯৮	২২,৫২৫,১৫৭	২.০৮	০.১৮	১২২,৬৮২,৯১৫	২.১০	০.০৬
১৯৯৭	২২,০৬৫,২৫০	৮.৭৫	০.১৮	১২০,১৮০,৫৪৪	২.১৩	০.০৬
১৯৯৬	২০,২৮৯,৭৮১	১.৫৩	০.১৭	১১৭,৬৪৯,৯৩২	২.১৫	০.০৬
১৯৯৫	১৯,৯৮৪,১৯৩	২২.৬৩	০.১৭	১১৫,১৬৯,৯৩০	২.১৯	০.০৬
১৯৯৪	১৬,২৯৬,৬০৯	৮.২৩	০.১৪	১১২,৭৩৭,৯৮৩	২.১৬	০.০৫

সাল	জীবাশ্ম CO_2 নির্গমন (টন)	CO_2 নির্গমনের পরিবর্তনের হার (শতকরা)	মাথাপিছু CO_2 নির্গমন (টন)	জনসংখ্যা	জনসংখ্যার পরিবর্তন (শতকরা হারে বার্ষিক)	বিশ্ব CO_2 নির্গমনের হার (শতকরা)
১৯৯৪	১৬,২৯৬,৮০৯	৮.২৫	০.১৪	১১২,৭০৭,৬৮৩	২.১৬	০.০৫
১৯৯৩	১৫,০৫৭,৮০২	৫.৮৫	০.১৪	১১০,৩৫০,৬৩৯	২.১৯	০.০৪
১৯৯২	১৪,২২৫,১০২	১২.৪১	০.১৩	১০৭,৯৮৩,৭০৪	২.২৬	০.০৪
১৯৯১	১২,৬৫৪,২০৫	-৬.০৯	০.১২	১০৫,৫৯৬,১২৭	২.৩৫	০.০৪
১৯৯০	১৩,৪৭৫,০৮৩	৫.৮৮	০.১৩	১০৩,১৭১,৯৫৬	২.৪৬	০.০৪
১৯৮৯	১২,৭২৬,৮৫৫	৯.১৬	০.১৩	১০০,৬৬৫,৪৯৭	২.৫৬	০.০৪
১৯৮৮	১১,৬৫৯,৪১৩	৫.৩৯	০.১২	৯৮,১৮৬,৩৫০	২.৬৩	০.০৪
১৯৮৭	১১,০৬২,৮৫১	১২.৬৮	০.১২	৯৫,৬৭১,১৬৩	২.৬৭	০.০৩
১৯৮৬	৯,৮১৭,৫১৭	১১.০০	০.১১	৯৩,১৮৭,৬০৩	২.৬৭	০.০৩
১৯৮৫	৮,৮৪৪,৫৭৩	১৬.৭৭	০.১০	৯০,৭৬৪,১৮৩	২.৬৬	০.০২
১৯৮৪	৭,৫৭৪,১৩৮	৪.৩১	০.০৯	৮৮,৪১৬,৫২১	২.৬৪	০.০২
১৯৮৩	৭,২৬১,২৪২	-৫.৯২	০.০৮	৮৬,১৪২,৪৯৫	২.৬৩	০.০২
১৯৮২	৭,৭১৭,৯২৮	৮.৬৩	০.০৯	৮৩,৯৬২,১২৭	২.৬৫	০.০২
১৯৮১	৭,১০৪,৫০৬	-২.৬৮	০.০৯	৮১,৭৬৭,৫১৫	২.৬৭	০.০২
১৯৮০	৭,৩০০,৪৫৮	১২.৭৯	০.০৯	৭৯,৬৩৯,৪৯১	২.৭২	০.০২
১৯৭৯	৬,৪৭২,৬৭৮	১১.৪৭	০.০৮	৭৭,৫২৯,০৪৫	২.৭৬	০.০২
১৯৭৮	৫,৮০৬,৭৮৪	৭.৫৫	০.০৮	৭৫,৪৫০,৩৫২	২.৭০	০.০২
১৯৭৭	৫,৩৯৯,২৮০	২.৩৪	০.০৭	৭৩,৪৬৩,৫৮৪	২.৫৩	০.০২
১৯৭৬	৫,২৭৫,৮৫৫	৭.২৯	০.০৭	৭১,৬৫২,৩৬১	২.২৯	০.০১
১৯৭৫	৪,৯১৭,২৫১	১৮.৯২	০.০৭	৭০,০৬৬,৩০১	১.৯৩	০.০১
১৯৭৪	৪,১৫৫,০২১	৬.৯৩	০.০৬	৬৮,৭৪২,২৩৪	১.৬৩	০.০১
১৯৭৩	৩,৮৬৬,৮৮৩	১৯.০২	০.০৬	৬৭,৬৫৭,৫৩০	১.৫২	০.০১
১৯৭২	৩,২৪৯,০৫৯	৪.৮৫	০.০৫	৬৬,৬২৫,৭০৫	১.৬৭	০.০১
১৯৭১	৩,০৯৮,৭৮৫	-০.৪০	০.০৫	৬৫,৫৩১,৬৩৩	২.০২	০.০১

উৎস: https://www.worldometers.info/co2-emissions/bangladesh-co2-emissions/, Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), CO_2 Emissions from Fuel Combustion – IEA, World Population Prospects: The 2019 Revision - United Nations Population Division

উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশে দীর্ঘ তিন দশকে নগরীয় জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ এখনো এক প্রবল গতিতে এদেশের নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (বার্ষিক প্রায় ৫ শতাংশ হারে)। অর্থাৎ বিশ্বের নগরায়ণের চেয়ে (২.৫০ শতাংশ) দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি হচ্ছে এখানে (ইসলাম, ২০২১)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নগরায়ণের মাত্রা মাত্র ৩০ শতাংশ কিন্তু দেশের মোট জিডিপি এ খাতের অবদান ৬৫ ভাগ। এ অবদান দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত করার পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের পথেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদেশের নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় গ্রাম-নগর অভিগমনকে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল চালক বিবেচনা করা হয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নত জীবনের আশায় অথবা বেঁচে থাকার তাগিদে ব্যাপকভাবে শহরমুখী বিশেষত রাজধানীসহ ঢাকা এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং রাজধানী ও বড় বড় শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন ক্রমশই দেশের ছোটো এবং মাঝারি আকারের শহর থেকেও রাজধানী কেন্দ্রিক অভিগমনকে ত্বরান্বিত করেছে। তাই নগরীয় জনসংখ্যার ঘনত্বে বড় শহরগুলোর প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রখ্যাত নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন দেশের মোট নগরীয় জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ প্রধানত দেশের চারটি মহানগরে কেন্দ্রীভূত (ইসলাম, ২০১১[৮])। ঢাকা নগর এলাকায় মাথাপিছু জিডিপি'র হার ১৫০০ ডলারের ওপরে। গত চার দশকে এই প্রবৃদ্ধির প্রভাব নগর কাঠামোয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঢাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে নতুন পরিবহণ ও আবাসন, বিপণীবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাসপাতাল-রোগ নির্ণয়কেন্দ্র, শিল্প-কলকারখানা এবং বিনোদনকেন্দ্রগুলোর মতো বিভিন্ন স্থাপনা। অর্থনৈতিক এ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ মাথাপিছু আয় তিন হাজার ডলার ছাড়িয়ে যাবে বা পাঁচ হাজার ডলারও হতে পরে বলে মনে করেন প্রখ্যাত নগর বিশারদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম (ইসলাম, ২০১১[৮])। এই উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে বিবেচনায় এনে নগরের বিভিন্ন এলাকা ও পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবকে পরিকল্পিতভাবে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নগরবাসীর জীবনাচরণ ও মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে, ২০২৫ সালের মধ্যে এদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক নগরবাসী হবে। দ্রুত বর্ধিত নগরের এ জনসংখ্যা একদিকে যেমন ন্যূনতম নাগরিক সুবিধার ক্ষেত্রে অগ্রতুলতা সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে দেশের ছোট-বড়

নগরের বিকাশে অপরিকল্পিত, অনিয়ন্ত্রিত তথা ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এটা শুধু নগরসমূহের বাসযোগ্যতা হ্রাস করছে না, এটি নগরের সার্বিক পরিবেশের ওপরও নানা ধরনের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতাও সৃষ্টি করছে, এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উষ্ণায়ন, কার্বন নির্গমনসহ আরো অনেক।

বাংলাদেশে নগর পরিকল্পনার ঐতিহ্য থাকলেও এর চর্চা অত্যন্ত সীমিত। আবার ব্যবহারিক পর্যায়ে পরিকল্পনার যতটুকু চর্চা হচ্ছে সেখানেও আদর্শ মানদণ্ড ও স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতি এখনো সুদূর প্রসারী নগর পরিকল্পনায় ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারছে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আমরা এখনো দেশের জন্য একটি জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালার অপেক্ষায় আছি। বলা বাহুল্য, দেশের প্রখ্যাত নগর বিশেষজ্ঞদের মেধা, জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে ২০০৬ সালে প্রস্তুতকৃত জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালাটির প্রথম খসড়া তৈরির পর, সর্বশেষ ২০১৪ সালে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার পর আরো প্রায় সাতটি বছর পেরিয়ে গেছে। ফলে নগরায়ণের আর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশিক অবস্থা উন্নয়ন সহায়ক না হয়ে দীর্ঘমেয়াদে অবনতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের অবক্ষয় এবং মানুষের অদূরদর্শী ও অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড এ ইঙ্গিতকে ভবিষ্যতের অনিরাপদ বাস্তবতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন, আয়তন ও সম্পদ এই তিনটি প্রপঞ্চ আমাদেরকে গ্রামীণ ঐতিহ্য থেকে ক্রমে নগর ঐতিহ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নগরের জনসংখ্যার আকারের ওপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল। বড় শহরে ভূমি ব্যবহার, শিল্পের বিকাশ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আবাসন ব্যবস্থাকে পরিকল্পনা মাফিক বিকশিত করা একটি জটিল প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এটি একটি প্রায় অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। সুতরাং, এদেশের সীমিত ভূখণ্ডে বিপুল জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত নগর উন্নয়ন সমন্বিতভাবে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় দেশের সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্ভাব্য যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে সরকার। এসকল কর্মসূচির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ জাতীয় পরিকল্পনা কৌশল তৈরি হয়েছে। সাইক্লোন সিডরের প্রতিক্রিয়ায় ২০০৮ সালে আংশিকভাবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) তৈরি হয়েছে পূর্ববর্তী ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (NAPA)-এর ওপর ভিত্তি করে। তবে, বিসিসিএসএপি-তে মূলত অভিযোজন প্রক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যেখানে সীমিত পরিসরে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস এবং স্বল্প মাত্রায় কার্বন নির্গমনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। তবে, কম কার্বন সহনীয় উন্নয়নের নীতিমালাসমূহ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ সমর্থন করেছে, যা কার্বন নির্গমন হ্রাসের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বল্পোন্নত দেশের জাতীয় সরকারসমূহ (এলডিসি) ক্রমবর্ধমানভাবে কম কার্বন সহনীয় উন্নয়নের প্রতি নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায়ও একে অন্তর্ভুক্ত করার নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করছে। কেননা, নিম্ন কার্বন সহনীয় উন্নয়ন কর্মসূচি শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতেই নয়, বিশ্বজুড়ে কার্বন সমস্যা সমাধানের জন্যও জরুরি।

পরিশেষে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর অধিকাংশই উন্নত বিশ্বে। তবে অনেক উন্নয়নশীল দেশে, এমনকি কিছু স্বল্প আয়ের দেশেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এরই পাশাপাশি বৈষম্যের বিস্তার হয়েছে প্রকটভাবে। সার্বিকভাবে সকল দেশে অভ্যন্তরীণভাবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হলো: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু অর্থনৈতিক, মানবিক, সামাজিক উন্নয়নে বৈষম্য ক্রমাগত অসমান রূপ নিচ্ছে। আমরা জানি উন্নয়নশীল দেশের নগরগুলো আজ কত দ্রুত হারে নগরায়িত হচ্ছে। ইউএন-হ্যাবিটাট বলছে, অতি দ্রুতই আফ্রিকা এবং এশিয়ার নগরসমূহে ৯০ শতাংশ নতুন অধিবাসী সংযুক্ত হবে (UN-HABITAT, 2021), যেখানে প্রয়োজন হবে নানা রকমের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এ উন্নয়ন নিশ্চিতভাবেই পরিবেশকে যত্ন করে হতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে নগরের শক্তির ব্যবহার ও কার্বন নির্গমনের প্রতি। কেননা, পরিবেশের ভারসাম্য আজ অতি দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে এবং জলবায়ু অনভিপ্রেত পথে দ্রুত ও গভীরভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে আশার কথা হলো ইতোমধ্যেই পরিবেশ রক্ষার নানারকম উদ্যোগ এবং কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম একটি প্ল্যান্ট ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে আইসল্যান্ডে। এই বৃহত্তম প্ল্যান্টটির নাম অরকা (Orca) (ছবি ১) (The Guardian, 9 September, 2021), তৈরি করেছে সুইজারল্যান্ডের ক্লাইমওয়ার্কস ও আইসল্যান্ডের কার্বফিক্স নামের দুটি প্রতিষ্ঠান। আশা করা হচ্ছে এই প্ল্যান্ট বাতাস থেকে বছরে চার হাজার টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করবে। এধরনের প্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিঘাতসমূহের সাথে যুদ্ধ জয়ে নিশ্চয়ই মানবগোষ্ঠীকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে, যদি এর ব্যবহার সকলের জন্য সুলভ করা যায়। পাশাপাশি ইউএন-হ্যাবিটাট এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মায়মুনাহ এম শরিফ এবছরের বিশ্ব

বসতি দিবসে যে আহ্বান জানিয়েছেন সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিটি বিনিয়োগ, প্রতিটি পদক্ষেপের টেকসই, কম-কার্বন এবং সহনীয় উন্নয়নের প্রতি। যা সকলে মিলে অগ্রসর হওয়ার পথকে করবে আরো প্রশস্ত, যেখানে অনগ্রসর থাকবে না কেউ। সকলের সচেতন পদক্ষেপ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল মানবসভ্যতার আজকের যে বিপর্যয়, তাকে মোকাবিলা করে আরো অনন্য এক উৎকর্ষতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

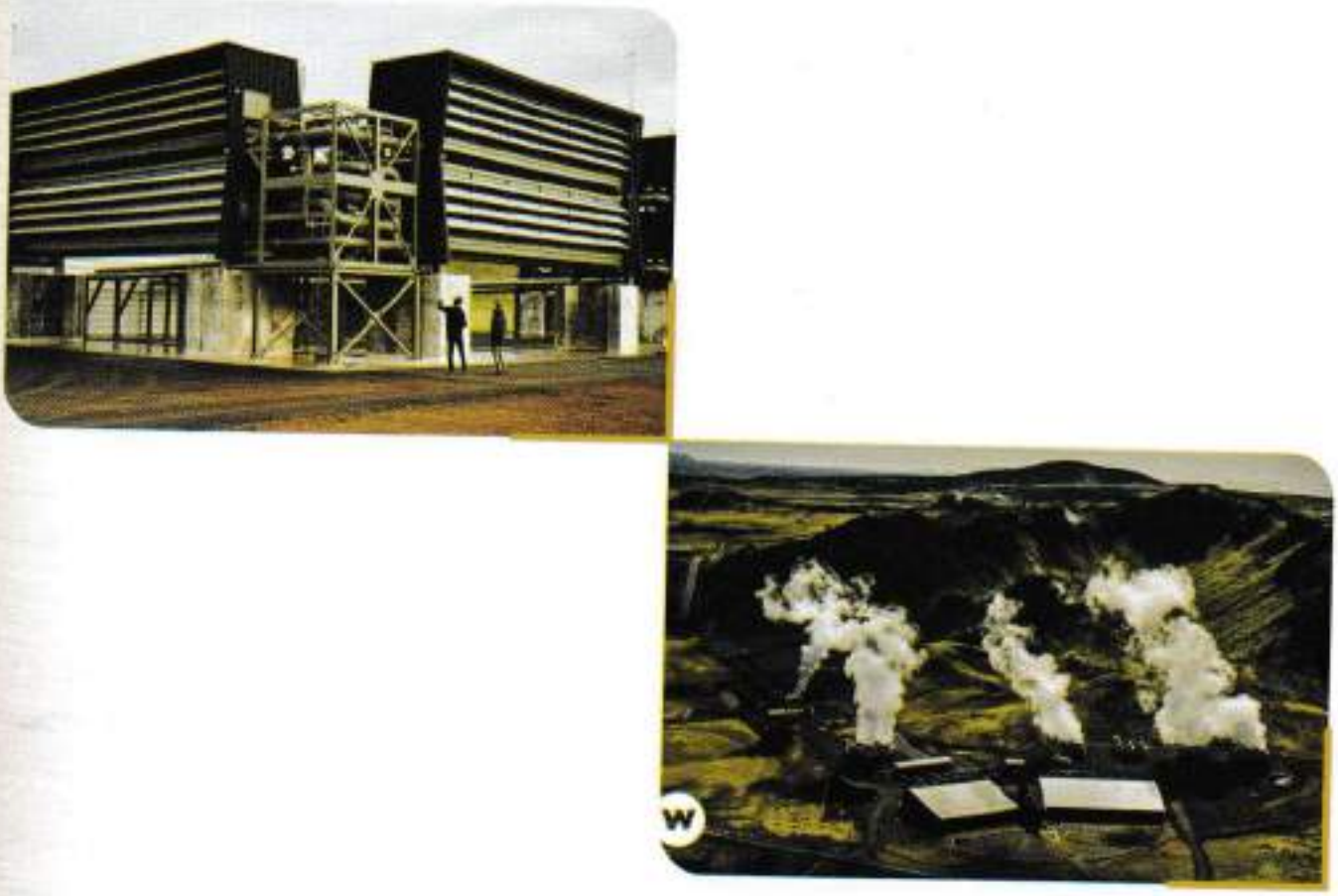

চিত্র ১: অরকা: আইসল্যান্ডে স্থাপিত বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ প্ল্যান্ট
(উৎস: গুগল হতে সংগৃহীত)

তথ্যসূত্র:

ইসলাম, ন. (২০২১)। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

ইসলাম, ম.শ. (২০১১ক)। বিশ্ব বসতি দিবস ২০১১: নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। মূল প্রবন্ধ। বিশ্ব বসতি দিবস স্মরণিকা ২০১১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃ: ১-৫।

ইসলাম, ন. (২০১১খ)। ২০৫০ সালের ঢাকা। বিশ্ব বসতি দিবস স্মরণিকা ২০১১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃ: ৬-১৪।

নাজিয়া, জৈ. ই. (২০১১)। জলবায়ু পরিবর্তন ও নগর: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে একটি মূল্যায়ন। বিশ্ব বসতি দিবস স্মরণিকা ২০১১। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পৃ: ৫৪-৫৮।

The Guardian, (9 September, 2021). "Carbon Capture and Storage (CCS) World's Biggest Machine Capturing Carbon from Air Turned on in Iceland". Available at: https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/09/worlds-biggest-plant-to-turn-carbon-dioxide-into-rock-opens-in-iceland-orca

UN-HABITAT. (2021). Accelerating Urban Action for a Carbon-free World. Concept Note, World Habitat Day 2021, UN-Habitat, 22 June 2021.

আমার গ্রাম
আমার শহর

এ কে এম এ হামিদ[১]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন- গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত শক্ত না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত মজবুত হতে পারে না। স্বাধীন দেশে জাতির পিতা সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য পর্যায়ক্রমে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ; গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ন; কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ; শিক্ষা, যোগাযোগ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু'র গ্রাম উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে এসেছেন, যা গ্রামীণ অবয়ব উন্নয়নে সত্যিই আশা-জাগানিয়া। এই প্রতিপাদ্যের ইতিবাচক দিক হলো- রাষ্ট্রীয় মূল দর্শনে গ্রাম উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আগামী প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও নাগরিক পরিসেবা নিশ্চিত করতে হলে গ্রামীণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও যোগান, প্রকৃতি প্রতিবেশ, মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে হবে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যেকোনো পরিকল্পনা টেকসই করতে হলে সেই পরিকল্পনা যে সুবিধাভোগীদের কল্যাণে গৃহীত; বিষয়টি তাদের অনুধাবনে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে সমন্বিত প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন বেগবান হয় এবং স্থিতিশীলতা পায়। বিষয়টি অনুধাবনে নিয়েই 'আমার গ্রাম আমার শহর' পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য হবে গ্রামাঞ্চলে কর্মসৃজন, নাগরিক সুযোগ সুবিধার প্রসার ও গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার হ্রাস করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেক ইউনিয়নে পরিকল্পিত আবাসন, শিক্ষা, কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রসার, চিকিৎসাসেবা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে আধুনিক শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে; যা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের সম্পূরক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জননন্দিত পরিকল্পনা 'আমার গ্রাম আমার শহর' গড়তে হলে অবশ্যই শহরের সুযোগ-সুবিধা স্বল্প পরিসরে হলেও গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। হ্রাস করতে হবে গ্রাম ও শহরের বৈষম্য। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, পানি, শক্তি, স্যানিটেশন, আবাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামবহুল বাংলাদেশ পল্লীসমাজ হিসেবে বিবেচিত হলেও এলাকাভেদে প্রত্যেকটি গ্রামের রয়েছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সেই নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার রূপরেখা বিবেচনায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাটবাজার, পাঠাগার, ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণের পাশাপাশি গ্রামীণ কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা বিবেচনায় শিল্পকারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে হবে। তবে, যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন, সেখানে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে। স্বল্প ভূখণ্ডের বাংলাদেশের আগামীর খাদ্য নিরাপত্তার দিক অনুধাবন করে কৃষি জমি সংরক্ষণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার বিকল্প নেই। সবুজ গাছপালা আমাদের গ্রামগুলোর প্রাণ। আমরা যেন অপরিকল্পিত পরিকল্পনায়

---

[১] প্রকৌ. এ কে এম এ হামিদ, উন্নয়ন গবেষক ও সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)

গ্রামগুলোকে শহরের রূপ দিতে গিয়ে সেই প্রাণে যেন ছেদ না ধরে, সে দিকে মনোযোগ দিতে হবে। প্রাকৃতিক জলাধার রক্ষা করে যেন পুষ্টি চাহিদা যোগানোর পাশাপাশি সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, সেজন্য গ্রামীণ জনপদের সকল গভীর-অগভীর জলাধার রক্ষাসহ পাহাড়ি অঞ্চলগুলোয় জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। গ্রামে 'ক্লিন এনার্জি' যেমন : বাতাস, সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, মাইক্রো-হাইড্রো-এর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং আশু করণীয় বিষয়কে স্থান দিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৯৭২ সালের ৩০ জুন সমবায় সম্মেলনে সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন"। তাঁর এ অভিব্যক্তির মাঝে গণমানুষের কল্যাণ কেন্দ্রিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে, তাতেই অন্তর্নিহিত রয়েছে-একটি সদ্য স্বাধীন দেশের এগিয়ে যাওয়ার পথনির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর এই আকাঙ্খা ধারণ করে যদি সকল রাজনীতিবিদ ও সর্বস্তরের সমাজপতিরা দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য "খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও উন্নত জীবন" প্রতিষ্ঠার রাষ্ট্রীয় মূল দর্শন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতো, তাহলে অনেক আগেই জাতি উন্নত ও মানবিক রাষ্ট্র পেত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে পরবর্তী সরকারগুলো এই মৌলিক চাহিদা পূরণে তেমন কার্যকর পদক্ষেপ নেয় নি। ফলে দুর্যোগপূর্ণ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বন্যা ও নদী ভাঙন কবলে পড়ে বাস্তুচ্যুত হয় এবং জীবিকার তাগিদে শহরমুখী হয়েছে। কিন্তু জনস্রোতের তুলনায় শহরগুলোর তাদের আবাসন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে– বাস্তুচ্যুত মানুষগুলো বাধ্য হয়ে রেললাইন, সরকারি খাসজমি, সড়কের পাশে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে আশ্রয়ের ঠিকানা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করেছে। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তিতে যদি গ্রামীণ জনপদ গড়ে তোলা যায়, তাহলে শহরমুখী মানুষের স্রোত কিছুটা হলেও থামানো সম্ভব হবে।

হতদরিদ্র জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে বিষয়টি সন্নিবেশিত করেন। বর্তমানে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১.৪নং লক্ষ্যে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সংবিধানের এই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহহীনদের গৃহ দেয়ার যে মানবিক উদ্যোগ নিয়েছেন, তা কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না। সেই দিক বিবেচনায় আইডিইবি স্টাডি করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তিনটি প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। প্রস্তাবগুলো হলো-

১) উঁচু জায়গা ও মাটির ধারণ ক্ষমতা বিবেচনায় বিভিন্ন স্থানে রান্নাঘর, টয়লেট ও বারান্দাসহ ২ বেডের সেমিপাকা টিনশেডের ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। এই প্রস্তাব ঠিকাদার অথবা প্রকল্প কমিটি দ্বারা বাস্তবায়ন করা যাবে।

২) ভাঙনপ্রবণ ও ভরাট মাটির উপর গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে টিনের চালা ও টিনের বেড়া দ্বারা স্থানান্তরযোগ্য ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। যেখানে প্লিন্থ লেভেল বা ফ্লোর লেভেল পর্যন্ত পাকা দেয়াল ও মেঝে পাকা করতে হবে। কখনো গৃহগুলো নদী ভাঙনের কবলে পড়লেও গৃহ গ্রহীতা স্বল্প ব্যয়ে ও সহজে অন্য যেকোনো স্থানে ঘরটি স্থানান্তর করতে পারবে।

৩) যদি সরকার অর্থায়ন করতে পারে তাহলে "আমার গ্রাম আমার শহর" এবং "কৃষি জমি রক্ষা কর-পরিকল্পিত গ্রাম গড়" প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নে জমি সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেক সুবিধাভোগীর অনুকূলে ২ শতাংশ মূল্যবান কৃষি জমি প্রদান না করে বরং ৫ শতাংশ জমিতে ৬তলা ভিতের উপর ছয়তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হতে পারে। যেখানে নীচতলায় কমন স্পেস (সকলেই পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারবেন) এবং অবশিষ্ট প্রতি তলায় ৪টি ফ্ল্যাট করে সর্বমোট ২০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা যেতে পারে, যার প্রতিটির আয়তন ৪৮০ বর্গফুট হবে। এতে করে নির্দিষ্ট ৫ শতাংশ জমিতে ২০টি পরিবার টেকসই গৃহে প্রায় শতবছর বসবাস করতে পারবেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব
জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মো: শামীম আখতার-এর
২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব
জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের
চেয়ারম্যান জনাব সেলোয়ার হোসেন-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব এবিএম আমান উল্লাহ নূরী-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জনাব লে. কর্ণেল (অব.) ফোরকান আমদ পিএসসি-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে এইচবিআরআই এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আশরাফুল আলম-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন চৌধিক-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে আবাসন পরিদপ্তরের পরিচালক জনাব মো: মমতাজ উদ্দিন-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: শহীদ উল্লা খন্দকারের উপস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ শরীফ কামাল চৌধুরী-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও চুক্তি (APA) স্বাক্ষর

রাজউক এবং Jica-এর মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায়
ট্রানজিট ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিসিএস (গণপূর্ত) ক্যাডারের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক সভায়
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ ২০২০-২০২১ অনুষ্ঠানে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ ২০২০-২০২১ অনুষ্ঠানে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি ও সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

কার্বনমুক্ত নগর বাস্তবায়নে পরিবেশবান্ধব বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীর স্থাপনা

স্থপতি নাহিদ ফেরদৌস দৃষ্টি[১]
ফারহানা খোন্দকার[২]

ভূমিকা

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বব্যাপী বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়। এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আবাসস্থলের অবস্থা এবং সকলের জন্য মৌলিক অধিকার হিসেবে পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন করা। পাশাপাশি বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, আমাদের শহর এবং শহরের ভবিষ্যত গঠনের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আমাদের সকলের। সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি শহরে বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হয়েছিলো এবং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Shelter is My Right"। ২০২০ সালের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Housing For All : A better Urban Future"। ২০২১ সালের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "Accelerating urban action for a carbon-free world" [১]। দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাপী শতকরা ৭০ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণের জন্য শহরের পরিবহন ব্যবস্থা, ইমারত ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়ী। তাই বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে সকল সংস্থা, সম্প্রদায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল stakeholder নিয়ে টেকসই, কার্বন-নিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শহর প্রতিষ্ঠার জন্য একত্রে কাজ করা।

পরিবেশবান্ধব বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী

মূলত, নগর দূষণের অন্যতম উৎস হলো নগর সংলগ্ন ইটভাটার কালো ধোঁয়া। ইট ভাটার ধোঁয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ব্ল্যাক কার্বন, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড-এর প্রধান উৎস। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন পোড়া মাটির ইটের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী। ভবিষ্যত বাংলাদেশের জন্য পরিবেশবান্ধব আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, এইচবিআরআই গত কয়েক বছর ধরে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে বালি ও সিমেন্টের তৈরি ব্লকের উন্নয়নে কাজ করে চলছে। United States Environmental Protection Agency-এর বিভিন্ন রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, প্রতি টন সিমেন্ট প্রস্তুতে ০.৫-০.৬ টন CO_2 নিঃসৃত হয় এবং সিমেন্ট কোম্পানিগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী গড়ে প্রতি টন সিমেন্ট উৎপাদনে ০.৬৫৪ টন CO_2 নিঃসৃত হয় [২]। সুতরাং, যেখানে ১০০০ পোড়ামাটির ইট প্রস্তুতে ০.৭ টন CO_2 নিঃসৃত হয় সেখানে ১০০০টি বালি ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত ব্লক প্রস্তুতে CO_2 নিঃসৃত হয় ০.৩ টন অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। সুতরাং শুধু ব্লক ব্যবহার প্রসারের মাধ্যমেই CO_2 নিঃসরণের হার অর্ধেক কমিয়ে আনা সম্ভব (চিত্রঃ ১)।

---

[১]সিনিয়র আর্কিটেক্ট, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
[২]সিনিয়র অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

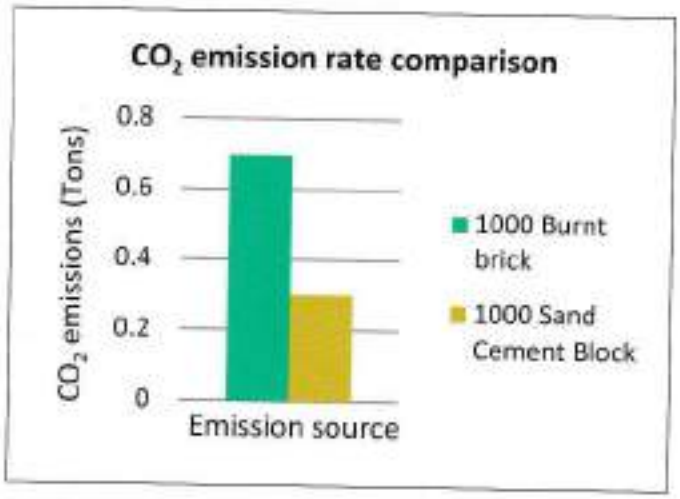

চিত্র ১: পোড়া মাটির ইট এবং বালি ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত ব্লক প্রস্তুতে CO_2 গ্যাস নির্গমন হারের তুলনা।

বালি ও সিমেন্ট দ্বারা নির্মিত এসব পরিবেশবান্ধব ব্লক উর্বর চাষযোগ্য মাটির ব্যবহার কমায়। এই ব্লকসমূহের প্রধান উপাদান হলো নদীর ড্রেজড বালি/মাটি। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ার কারণে এই উপাদান সারাদেশে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। সিমেন্ট এবং বালির সাথে এডমিক্সচার মিশ্রণের পরে এই ব্লকসমূহ কম্প্রেশন দ্বারা তৈরি করা হয়। সুতরাং কাঁচামালের প্রাপ্যতা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্লক ব্যবহারকে দেশের পরবর্তী সেরা নির্মাণ সামগ্রীতে পরিণত করা সম্ভব।

পরিবেশবান্ধব বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা নির্মিত স্থাপনা

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব এসব নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার এবং প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি এইচবিআরআই-এর তৃতীয় তলার সম্প্রসারণ কাজে পোড়া মাটির ইটের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে বিকল্প এসব নির্মাণ সামগ্রী। প্রায় ২৫০০ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এ স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে Non Fired Sand Cement Solid Block, Non Fired Sand Cement Hollow Block, Non Fired Solidification Block এবং ফেরো সিমেন্ট চ্যানেল। (চিত্র: ২)

চিত্র ২: এইচবিআরআই-এর তৃতীয় তলার সম্প্রসারণকৃত স্থাপনা।

স্থাপনাটির বাইরের দেয়ালে মূলত ব্যবহার করা হয়েছে Non Fired Sand Cement Solid Block। ব্লকগুলোর দাম পোড়ামাটির ইটের তুলনায় কম হওয়ায় নির্মাণ খরচ অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া এই ব্লক ব্যবহারের ফলে দেয়ালগুলোতে কোনো প্লাস্টার করার প্রয়োজন হয়নি। এর ফলে উভয় পার্শ্ব প্লাস্টার খরচ বাবদ প্রতি স্কয়ার ফিটে প্রায় ৫০-৬০ টাকা খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে। স্থাপনাটির বাইরের একটি দেয়ালে স্ক্রিন ওয়াল তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে Non Fired Solidification Block (চিত্র: ৩)।

(ক)

(খ)

চিত্র ৩: (ক) এইচবিআরআই-এর তৃতীয় তলার সম্প্রসারণকৃত স্থাপনা নির্মাণে Non Fired Sand Cement Solid Block এবং Non Fired Solidification Block-এর ব্যবহার, (খ) Non Fired Solidification Block দ্বারা নির্মিত ক্রিন ওয়াল।

স্থাপনাটির অভ্যন্তরীণ একটি দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে Non Fired Sand Cement Hollow Block। ব্লকগুলোর আকার (৪০০ মি.মি. x ২০০ মি.মি. x ১০০ মি.মি.) সাধারণ ইটের তুলনায় বড় হওয়ায় ৫টি ইটের জায়গায় একটি ব্লক ব্যবহার করা সম্ভব। এর ফলে কাঁচামাল, মজুরির নির্মাণ খরচ অনেকাংশে কমে যায়। তাছাড়া ব্লকটির ভিতরাংশ ফাঁপা হওয়ার কারণে এটি তাপ ও শব্দ কুপরিবাহী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। উক্ত দেয়ালে বৈদ্যুতিক তার ও সুইচ বোর্ড স্থাপনা ও সহজভাবে কনসিল পদ্ধতিতে করা সম্ভব (চিত্র: ৪)।

(ক)

(খ)

চিত্র ৪: (ক) Non-Fired Sand Cement Hollow Block
(খ) Non Fired Sand Cement Hollow Block দ্বারা নির্মিত দেয়াল।

স্থাপনাটির ছাদ নির্মাণে সিমেন্ট, পাথর ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাসকল্পে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচলিত আরসিসি কাস্ট-ইন-সিটু ছাদ ব্যবহারের পরিবর্তে ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল ব্যবহার করে ছাদ নির্মাণের ফলে নির্মাণ খরচ প্রায় ২০-২৫ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে (চিত্র-৫)।

চিত্র ৫: এইচবিআরআই-এর তৃতীয় তলার সম্প্রসারণকৃত স্থাপনায় ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল দ্বারা নির্মিত ছাদ।

এছাড়া, মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর Non Fired Sand Cement Solid Block ব্যবহার করে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। সীমানা প্রাচীরে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদর্শনের জন্য ভিনাইল স্টিকার সংবলিত ডিসপ্লে বোর্ড সংযোজন করা হয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, নগরী হচ্ছে প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি। একটি সুপরিকল্পিত নগরী একটি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান নগরীর কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা সম্ভব। ২০২১ সালের বিশ্ব বসতি দিবস এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, আসন্ন COP-২৬ (১-১২ নভেম্বর, ২০২১; গ্লাসগো, ইউকে) সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কারিগরি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ যেমন– জাতীয় বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, টেকসই ভবন নির্মাণ অনুশীলন, গণপরিবহণ এবং মোটরবিহীন যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৈদ্যুতিক পরিবহণ ব্যবস্থার প্রচলন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেনিটাইজেশন এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং সুপরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে কার্বনমুক্ত নগরী সর্বোপরি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। আর এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনসচেতনতা। এ ধরনের স্থাপনা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে ও তাদেরও এরূপ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ যোগাবে।

তথ্যসূত্র :

1) Day WH (2021) Accelerating urban action for a carbon-free world. 1–7
2) (2020) Energy Technology Perspectives 2020. Energy Technol Perspect 2020.
3) https://doi.org/10.1787/ab43a9a5-en

নির্মাণ কাজে অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট ব্যবহার: নগরের কার্বন দূষণরোধে এর সম্ভাব্যতা

মো. আকতার হোসেন সরকার[১]
সৈয়দ আহমদ তাসনিম[২]

পটভূমি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৮৫ সালে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার পরবর্তী বছর থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার প্রতি বছর বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী আবাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো সকলের সামনে তুলে ধরা ও তার বৈশ্বিক সমাধানে কাজ করাই বিশ্ব বসতি দিবসের উদ্দেশ্য। এ বছরে UN-Habitat কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য হলো "Accelerating urban action for a carbon free world."

বৈশ্বিক নগরায়ণ

বিশ্বজুড়ে নগরসমূহ অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। মানুষ গ্রাম থেকে নগরের দিকে ধাবিত হওয়াতে প্রধান নগরসমূহের আকার আয়তন যেমন বেড়ে চলছে তেমনি নগরকেন্দ্রিক আবাসন সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মানুষ নগরে বসবাসের কারণে নগর এলাকাগুলি নগরায়ন, বিশ্বায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বিশ্বের নগরসমূহে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যার পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৭০ ভাগ।

বাংলাদেশে নগরায়ণ ও নগরীয় দূষণ

বাংলাদেশের নগরায়ণ বৈশ্বিক পরিস্থিতির চেয়ে দ্রুত গতিতে ঘটছে। কৃষিজমি হ্রাস পাওয়া এবং দেশের শিল্পায়নের উন্নতির ফলে আমাদের দেশে খুব দ্রুত নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। নগরায়ণের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা ২০০১ সালে ২৩% থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০%। দেশের অর্থনীতিতে এই নগরমুখী মানুষের অবদান বহুমুখি, কিন্তু এর সাথে পাল্লা দিয়ে এই বর্ধিত জনসংখ্যার আবাসন নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ। আবাসন খাতে নির্মাণ সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার নগরে কার্বন দূষণের অন্যতম উৎস।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব নির্মাণের বিষয়টি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্বের অনেক দেশই তাই টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহারের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে পরিবেশবান্ধব নির্মাণকে বিবেচনা করছে। কারণ বিশ্বের বেশির ভাগ সম্পদ ব্যবহারে, বিশেষত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে,

[১] সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
[২] সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। পরিবেশবান্ধব নির্মাণের বিষয়টি এশিয়া অঞ্চলের জন্য বেশি প্রযোজ্য, কারণ বিশ্বের ষাট শতাংশেরও অধিক লোকের বাস এ অঞ্চলে। এর মধ্যে ২০০ কোটির অধিক লোক নগরাঞ্চলে বসবাস করে।

ভবিষ্যৎ নগর জনসংখ্যার এই বিশাল চাহিদার প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য আবাসন সংস্থানের লক্ষ্যে কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট সম্পন্ন টেকসই নির্মাণ উপকরণ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। পোড়ামাটির ইট তৈরিতে যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড ও কার্বন নির্গত হয় একইভাবে এর বিকল্প ব্লক এ ব্যবহারে সিমেন্ট তৈরিতে প্রচুর কার্বন দূষণ হয়। সিমেন্ট শিল্প কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরিতে অন্যতম শিল্পগুলোর একটি। এ বৈশ্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ৮% এই শিল্প হতে নির্গত হয়।

এর ৫০ ভাগ রাসায়নিক প্রস্তুতিতে এবং ৪০ ভাগ জ্বালানি পুড়িয়ে উৎপন্ন হয়। প্রতি টন সিমেন্ট প্রস্তুতিতে প্রায় ৯০০ কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। সিমেন্ট, কংক্রিট-এর ব্যবহার হ্রাস যত বেশি করা সম্ভব হবে ততই এ খাতের কার্বন দূষণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষাপটে যে বিকল্পটি সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে তা হলো অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট।

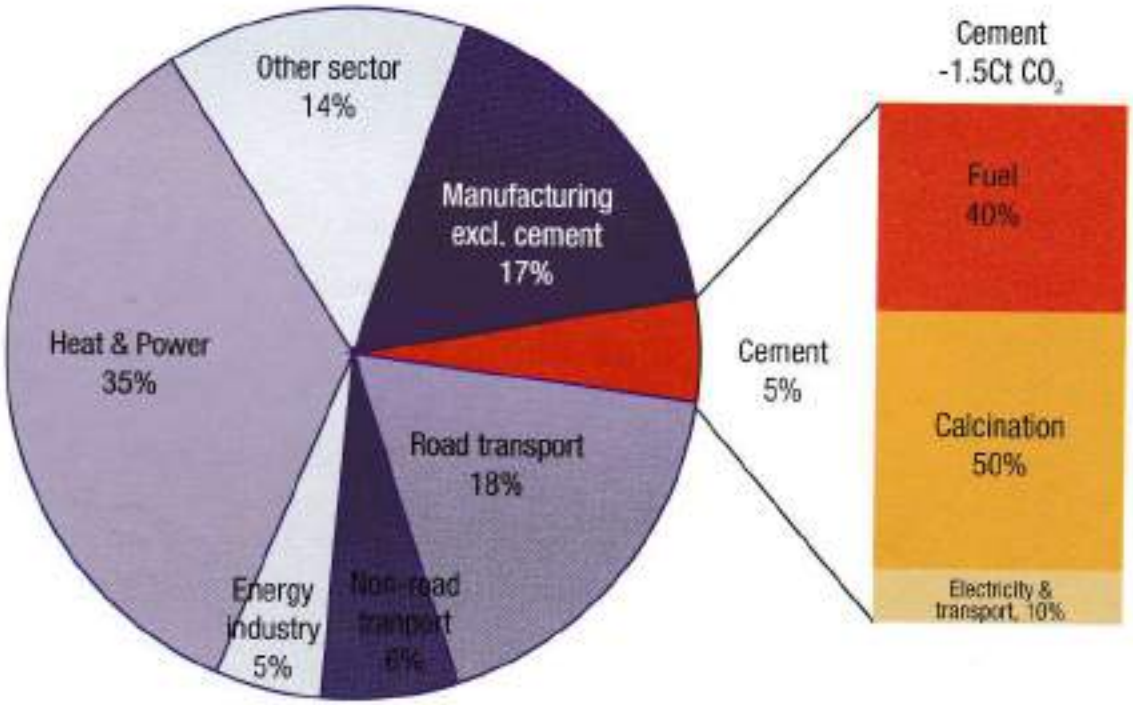

চিত্র-১

নির্মাণ খাতে সিমেন্ট শিল্প ও তার সাথে কার্বন দূষণের সরাসরি সম্পর্ক অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট

এরিয়েটেড কংক্রিট ব্লকের মূলকথা হলো এতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাধ্যমে এরিয়েশন করা হয়। ফলে ব্লকটি হয় ফাঁপা এবং ওজনে হালকা। এটি বিভিন্ন আকৃতিতে বানানো যায়। প্রয়োজনে কেটে বিভিন্ন আকৃতিতে তৈরি করে নেওয়া যায়। আকৃতি বাছাই এর এই স্বাধীনতা অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট ব্লক-এর ব্যবহারযোগ্যতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনমতো ব্লক, প্যানেল ইত্যাদি আকৃতিতে অটোক্লেভ এরিয়েটেড কংক্রিট পাবেন। এতে প্রস্তুতকারীকে ভিন্ন ভিন্ন মোল্ড ব্যবহার করতে হবে না। অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট-এর এ উপযোগিতাকে ভবিষ্যতে জনসাধারণের প্রিয় নির্মাণ সামগ্রীতে পরিণত করবে বলে আশা করা যায়।

Experiment	Sand	Cement	Lime	Water	Curing Information	Density kg/m^3
01	70%	20%	10%		1.7MPA pressure & $196^{0}C$ temperature	514
02	70%	10%	20%			657
03	70%	10%	20%			724
04	60%	30%	10%			649
05	60%	30%	10%	200ml	Curing time:10hours	593

হালকা ওজন অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট-এর অন্যতম উপযোগিতা, এইচবিআরআই ল্যাব-এ তৈরি বিভিন্ন অটোক্লেভ এরিয়েটেড ব্লকের ঘনত্বের উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, যেখানে প্রচলিত ইটের ক্ষেত্রে তা প্রায় ২০০০ কেজি/মি³।

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনায় অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট:

এসব দিক বিবেচনায় নিয়েই বাংলাদেশ সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট নিয়ে বিস্তারিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে নির্দেশনা দিয়েছে। প্রচলিত ইটের বিকল্প হিসেবে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ থেকে শুরু করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যথা– ভারত, চীনসহ মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ দেশ অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট ব্যবহার করে আসছে। অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট ব্লক লোকাল বালি (ড্রেজড সেন্ড), লাইম, এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, অল্প পরিমাণ সিমেন্ট মিশিয়ে অটোক্লেভিং করে প্লান্ট-এর মাধ্যমে নন ফায়ার কংক্রিট ব্লক উৎপাদন করা হয়। এটি ব্যয় সাশ্রয়ী, লাইট ওয়েট, পরিবেশবান্ধব গ্রিন ম্যাটেরিয়ালস, বিশেষ করে ভূমিকম্প সহনীয় ও অগ্নিপ্রতিরোধক। অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট প্লান্টে স্বল্প শ্রমিক ও স্বল্প ব্যয়ে ব্লক, ওয়াল প্যানেল এবং ফ্লোর প্যানেল তৈরি করা যায়। এর প্রেক্ষিতে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটি পাইলট প্লান্ট তৈরি করছে। শুধু তাই না, উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে একটি অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রস্তাবনা তৈরি করে তা অচিরেই অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।

চিত্র-২ : হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ স্থাপনাধীন অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট প্লান্ট

চিত্র-৩: হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রস্তুতকৃত অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট প্লান্ট সাইলো, মন্ড ও রেইল

যেহেতু ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সরকারি নির্মাণ কাজে পোড়ামাটির ইটের ব্যবহার বন্ধ হতে চলেছে এই প্রেক্ষাপটে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীসমূহের মধ্যে ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনায় অটোক্লেভ এরিয়েটেড কংক্রিট ব্লক একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে বলে ধরে নেওয়া যায়।

উপসংহার

শিল্পায়িত অর্থনৈতিক যুগে শহরগুলোতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ একটি আধুনিক বাস্তবতা। উন্নত জীবনের আশায় মানুষের শহরমুখী চাপ অব্যাহত থাকবে। এই বাড়তি মানুষের আবাসন নিশ্চিত করতে নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্বন দূষণ এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে। De coupling of development with emission যেমন পরিবেশ সংরক্ষণের একটি অন্যতম ধারণা ঠিক তেমনি De coupling of construction with cement and affiliated pollution এমন একটি ধারণা অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট-এর মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব। তাই বলা যায়, যথাযথ ও সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরিবেশবান্ধব বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আগামী দিনের নগরীয় নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কার্বন দূষণরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্যসূত্র

1. Lehne, Johanna; Preston, Felix. Making Concrete Change: Innovation in Low Carbon Cement and Concrete. Chatham House. Chatham House
2. A. Samarin , "Wastes in Concrete :Converting Liabilities into Assets", in Ravindra K. Dhir; Trevor G. Jappy (eds.). Exploiting wastes in concrete: proceedings of the international seminar held at the University of Dundee, Scotland, UK
3. Mahasenan, Natesan; Steve Smith; Kenneth Humphreys; Y. Kaya . "The Cement Industry and Global Climate Change: Current and Potential Future Cement Industry CO2 Emissions". Greenhouse Gas Control Technologies – 6th International Conference. Oxford:

Understanding a Carbon Free World Actions in the Urban Areas of Bangladesh

Prof. Dr. Mohammad Ghulam Murtaza[1]

Introduction

The theme for this year's World Habitat Day (2021) is "accelerating urban action for a carbon-free world". Cities across the world are responsible for some 70 percent of global carbon dioxide emissions with transport, buildings, energy, and waste management accounting for the bulk of urban greenhouse gas emissions. Concomitant to this, Bangladesh being a developing country is rapidly urbanizing. Over the years, the industrial development in Bangladesh is also note-worthy but its unplanned waste discharge is a matter of concern. There are carbon emissions from the industries, factories, commercial complexes, tall buildings, etc. causing the climate very vulnerable. However, it is imperative to reduce CO_2 and as well as greenhouse gas emissions in Bangladesh.

Greenhouse gas emissions from the above- mentioned sources come from fossil fuel combustion for heating and cooking needs, management of waste and wastewater, and leaks from refrigerants in homes and businesses. Bangladesh is an energy-inefficient country. In order to raise the efficiency with which is produced and consumed energy, there is need to increase energy supply while lowering carbon emission. This would allow to lower carbon emissions without jeopardizing energy security and economic growth. Energy efficiency means using less energy to provide the same service. It is a key to substantial CO_2 reduction as well as an important policy to be targeted for all urban areas of Bangladesh.

Improving the insulation of buildings; using more energy-efficient heating, cooling, ventilation and refrigeration systems; efficient fluorescent lighting and electric fan; improved cooking stove and using metered gas; passive heating and lighting to take advantage of sunlight; and the purchase of energy-efficient appliances and electronics are the ways to reduce energy consumption and thus CO_2 emissions. Moreover, reducing urban solid waste sent to landfills, capturing and using methane produced in current landfills is effective to solid waste management as well as to reduce CO_2 emissions.

However, the theme of this year's World Habitat Day (2021) i.e., accelerating urban action for a carbon-free world is very much useful and relevant in context of the urbanization scenario of Bangladesh and has to be duly addressed through undertaking effective actions and programs to this effect. This paper discusses the concepts relevant to carbon free world for clear understanding the issue, there of arisen problems, existing policies and plans, and actions needed to be taken.

[1] Professor, Centre for Urban Studies

Concepts related to a carbon free world

Carbon zero means emissions are not being produced. Carbon neutral means some emissions are generated but offset somewhere else to make overall emissions zero. The strain on the climate is eliminated by shrinking or compensating for global greenhouse gas emissions including carbon dioxide. Carbon neutrality refers to achieving net-zero carbon dioxide emissions. This can be done by balancing emissions of carbon dioxide with its removal (often through carbon offsetting) or by eliminating emissions from society.

Although the term "carbon neutral" is used, a carbon footprint also includes other greenhouse gases, measured in terms of their carbon dioxide equivalence. The term climate-neutral reflects the broader inclusiveness of other greenhouse gases in climate change, even if CO_2 is the most abundant. The term "net zero" is increasingly used to describe a broader and more comprehensive commitment to decarbonization and climate action, moving beyond carbon neutrality by including more activities under the scope of indirect emissions, and often including a science-based target on emissions reduction, as opposed to relying solely on offsetting.

In conclusion, a carbon free world means a place or largely the whole globe where there is carbon neutrality and carbon is negative i.e., removing more carbon than the emission.

The state of affairs in the urban areas of Bangladesh

Bangladesh has targeted be a middle-income country by 2021 and this requires to increase its GDP growth to 7.5-8 per cent per year. Both public and private sectors investment will be increased as well. To sustain such accelerated growth, Bangladesh will need to manage her urbanization more effectively, and part of this will be the increasing demand for energy. Energy shortage is one of critical infrastructure constraints in Bangladesh which significantly impedes her economic growth. At present, 62 percent of the total population has access to electricity (including off-grid renewable energy) and this has been possible due to the Government's massive efforts. There is still much to do for the energy-poor population, especially in rural and low income urban settlements areas. Biomass supply/demand accounts for 68 per cent of primary energy consumption, and over 90 percent of household energy needs. In other words, only about 10 percent of the population has access to modern fuels. Annual household biomass consumption is 44 million tons, or 79 per cent of the country's total biomass consumption. Fuel wood constitutes 41 percent of the total biomass cooking energy and 84 percent of households are depend on fuel wood for cooking.

Lack of access to modern energy services and the use of traditional fuels for cooking, heating and lighting deter economic development of Bangladesh as well as have serious health impacts. Household energy use is more complex, with many homes 'fuel stacking', that is using multiple fuels/stoves at one time. About 90 per cent of the population depends on traditional fuel-free biomass as cooking fuel.

In most of the larger urban settlements, solid waste is sent to landfills for disposal which is another source of carbon emission. The greenhouse gases emitted during industrial production are split into two categories: direct emissions that are produced at the facility, and indirect emissions that occur off site. CO_2 emissions from transportation sector in urban areas results from the combustion of petroleum-based products, like gasoline, in internal combustion engines. Other larger sources of emissions include passenger cars and light-duty trucks, including sport utility vehicles, pickup trucks, and mini-vans. These sources account for over half of the emissions. The remainder comes from other modes of transportation, including freight trucks, ships, boats, and trains, etc.

Policy Framework and Institutional Mechanisms

The Government has taken a number of initiatives from three distinct approaches/perspectives towards universal energy access namely, (i) energy efficiency, (ii) renewable energy, and (iii) energy conservation. National level policy and rules were drawn up as part of defining the institutional framework. In 2008, a renewable energy policy was adopted by the Government. This envisions 5 percent of total generation from renewable sources by 2015 and 10 percent by 2020. The policy has several objectives, including: harnessing the potential of renewable energy resources and the dissemination of renewable energy

technologies (RETs) in rural and urban areas; enabling, encouraging and facilitating public and private sector investment in renewable energy projects; developing sustainable energy supplies to substitute indigenous non-renewable energy supplies; scaling up the contribution of renewable energy to electricity production; facilitating the use of renewable energy at every level of energy usage; promoting development of local technology in the field of renewable energy; and promoting clean energy for the clean development mechanism (CDM).The urban local governments in Bangladesh have not been empowered to deal with the problems related to energy consumption and it is the matter of the central government institution.

Needed Areas of Actions

A: Industrial sector

- Use energy efficient furnace, steam boiler and motor.
- Switch to fuels that result in less CO_2 emissions but the same amount of energy, when combusted.
- Use natural gas instead of coal to run machinery.
- Produce industrial products from materials that are recycled or renewable, rather than producing new products from raw materials.
- Use scrap steel and scrap aluminum as opposed to smelting new aluminum or forging new steel cause less CO_2 emissions.
- Making companies and workers aware of the steps to reduce or prevent emission leaks from equipment.

B: Transportation sector

- Use public buses that are fueled by compressed natural gas rather than gasoline or diesel.
- Use electric or hybrid automobiles provided that the energy is generated from lower-carbon or non-fossil fuels.
- Use renewable fuels such as low-carbon biofuels.
- Develop advanced vehicle technologies such as hybrid vehicles and electric vehicles that can store energy from braking and use it for power later.
- Build public transportation, sidewalks, and bike paths to increase lower-emission transportation choices.
- Encourage mixed use areas, so that residences, schools, stores, and businesses are close together, reducing the need for driving.
- Promote environmentally friendly commuting.
- Establish carpool initiatives for employees.
- Use shared vehicles instead of purchasing them. Car sharing services like Zip Car are inexpensive and convenient and feature efficient transportation choices.
- Take measures to improve road traffic flow.

C: Introducing Green Buildings

All development authorities and the Paurashavas should encourage constructing green buildings to build not only in vacant lands, but also the existing buildings can be transformed into sustainable buildings. Green Buildings can reduce up to 40 per cent of carbon dioxide emission and 50 percent of overall energy consumption (USEPA, 2012).

D: Legal Framework

It is noticed that there are more gas emissions in the urban areas than that of the rural areas. The Paurashavas in Bangladesh have not been legally empowered to handle this problem. Neither these authorities have trained man-power in the field. There is urgent need to revisit the Local Government (Paurashava) Act, 2009 and arrange to incorporate the issue of energy consumption and gas emission in details. .

E: Unveiling the Facts

General people, decision makers and other stakeholders should be fully aware of the consequences of construction of any kind of infrastructure on climate change. Importantly, before undertaking a large scale project, the long term impacts should be accurately analyzed. This analysis is very rear in Bangladesh. Large scale power stations, nuclear- power plants and chemical industries are taken in most vulnerable lands even being informed about the harmful impacts. The technical analysis of economic and environmental impacts of climate change should be incorporated. The analysis should establish a bottom-up computation methodology and provide realistic assessment based on scientific analysis encompassing community experience. In national level, the findings and suggestions would be presented in a number of workshops with stakeholders such as environmentalists, planners, and policy makers and so on.

F: Awareness Building

Our people are not aware about environmental degradations, governance, violation of environment rules, etc. They need to be aware especially the community based development focusing on risk reduction. There can be a program of raising awareness of community people by video, drama, multimedia, intermediate technology, art, case studies and storytelling or demonstrating by installing or improving infrastructures in the community.

Concluding Observations

On the occasion of the observance of the World Habitat Day 2021 in Bangladesh, let all of us endorse the remark of UN-Habitat Executive Director Maimunah Mohd Sharif made prior to observe the Day that

"With our attention focused on responding and recovering from the COVID-19 crises, let us ensure that every action we take today, every investment and support we mobilize, stimulates more sustainable, low-carbon and resilient development pathways that leave no one and no place behind."

Lastly, but not the least, let all the stakeholders come forward to act together accordingly in search of a carbon free world, in general and a carbon free Bangladesh, in particular.

References

Bangladesh Gazette, Bangladesh National Parliament, Local Government (Paurashava) Act, 2009, Government of the People's Republic of Bangladesh, 6 October 2009.

Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2009). moef.gov.bd. Retrieved July 17, 2014, from Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009:http://www.moef.gov.bd/climate_change_strategy2009.pdf.

Satterthwaite, D. H. (n.d.). Adapting to Climate Change in Urban Areas. IIED Publications, 60-120.

USEPA. (2012). Green Building. U.S. Environmental Protection Agency Retrieved July 14, 2014 fromwww.epa.gov/greenbuilding/pubs/faqs.htm.

UN Habitat, Concept Note, World Habitat Day, 2021, 22 June 2021

নেট কার্বন শূন্য পরিবেশ : নগর উন্নয়ন কি দায়িত্বশীল নগর উন্নয়ন?

শুভঙ্কর সুস্ময় রায়[1]

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তব অগ্রগতি নিরূপণে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে UNFCCC (The United Nations Framework Convention on Climate Change) কাঠামোর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ প্রতিবছর Conference of Parties (COP) সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকে। COVID-19 অতি মাত্রার কারণে স্থগিত ২০২০ সালের সম্মেলনটি এবার অনুষ্ঠিত হবে ২০২১ সনের নভেম্বর মাসে, যেটি জাতিসংঘের ২৬তম জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন বা COP26 নামে পরিচিত। COP26 সম্মেলনের এবারের global Campaingটি হলো "Global Race To Zero": যেখানে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে শূন্য কার্বন নিঃসরণ নিশ্চিতকরণে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা/কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। COP26-এর এ global Campaingটি আরও বেগবান করেছে জাতিসংঘের "World Habitat Day-2021" বা "বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১" এর মূল প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে "Accelerating Urban Action for Carbon-free World". যেখানে শহর পর্যায়ের স্থানীয় সরকারকে শূন্য/স্বল্প কার্বন নিঃসরণ নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। যার প্রথমেই কার্বন-শূন্য পৃথিবী ও নগরায়ন বলতে কি বোঝায় এবং কীভাবে একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বাকি দুটি অংশের একটিতে কার্বনের শূন্য/স্বল্প নিঃসরণের গুরুত্ব ও সুফলসমূহ এবং সবশেষে কার্বনের শূন্য/স্বল্প নিঃসরণ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কার্বন-শূন্য পৃথিবী ও নগরায়নের যোগসূত্র

কার্বন শূন্য পৃথিবী বলতে এমন এক পৃথিবীর কথা চিন্তা করা হয়েছে, যে কোনো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) নেট পরিমাণ হবে শূন্য অথবা খুব স্বল্প পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হবে এবং এই স্বল্প পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড অন্য কোনো উৎস/মাধ্যম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শোষিত হবে। কার্বন শূন্য বা নেট কার্বন ডাই-অক্সাইড শূন্য অর্জনের দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যার একটি হলো কার্বন অফসেটিং যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণকে Compensate বা পুষানোর জন্যে অন্য এলাকার কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমাতে হয়, যাতে নেট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। এ পদ্ধতির আওতায় বর্তমান পৃথিবীতে Emission Trading চালু আছে যাতে প্রতিটি দেশের জন্য নির্গমন মাত্রা (Emission Cap) নির্দিষ্ট করা আছে এবং অব্যবহিত নির্গমনমাত্রা অন্য দেশের সাথে Trade বা বিক্রি করার ব্যবস্থা আছে। নেট কার্বন ডাই-অক্সাইড শূন্য অর্জনের অন্য পদ্ধতিটি হলো জীবনযাপন, কলকারখানার উৎপাদন, ও যাতায়াতসহ সকল ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস কমানো গেলে। অন্যদিকে, নগরায়নের বিবর্তন দেখলে বোঝা যায় বিবর্তিত নগর অনেকগুলো নাগরিক ও অর্থনৈতিক সুফল প্রদানের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও তৈরি করছে। উদাহরণস্বরূপ, নগরায়ণের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হলো বাড়তি শহুরে জনসংখ্যার সংকুলান করতে কৃষি বা ফাঁকা জমি পরিবর্তন করে জনবসতি নির্মাণ, যাকে support করতে আবার প্রয়োজন হয় আধুনিক সব মেশিন সমৃদ্ধ কলকারখানা যা কম সময়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে। এছাড়াও, বাড়তি জনসংখ্যা রাস্তায় বাড়তি ট্রাফিক এবং ট্রাফিক জেটি তৈরি করে। এভাবে, নগরায়ন

[1] অথরাইজড অফিসার, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ : BURP (BUET), MDS (DU), MURP (UIUC, USA)

বিবর্তনের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই শহরের বায়মণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন বৃদ্ধি করে। সুতরাং, কার্বন শূন্য পৃথিবী ও নগরায়ণের সম্পর্কটিকে একটি ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বললে একেবারে ভুল বলা হবে না।

নিচের চিত্রটি (চিত্র-১) থেকে উল্লিখিত সম্পর্কটির একটি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যায়। চিত্রটিতে দেখানো আছে ২০০৯ সালের পর থেকে পৃথিবীর সর্বমোট জনসংখ্যার বেশির ভাগ মানুষ শহরে বসবাস করছে, যদিও এর আগে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। বৈশ্বিকভাবে শহুরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের উপর এ বিরূপ প্রভাব এর কথা বিবেচনা করেই ২০১৫ সালে শেষ হওয়া MDG (Millennium Development Goals)-এর মতো পরিবেশকে নিয়ে টেকশই উন্নয়নের মতো বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো সারা পৃথিবীতে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ এখন শুধু নগরায়ণ নিশ্চিত করলেই হবে না সাথে সাথে দায়িত্বশীল নগরায়ণের মাধ্যমে টেকশই উন্নয়নের জন্য পরিবেশকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

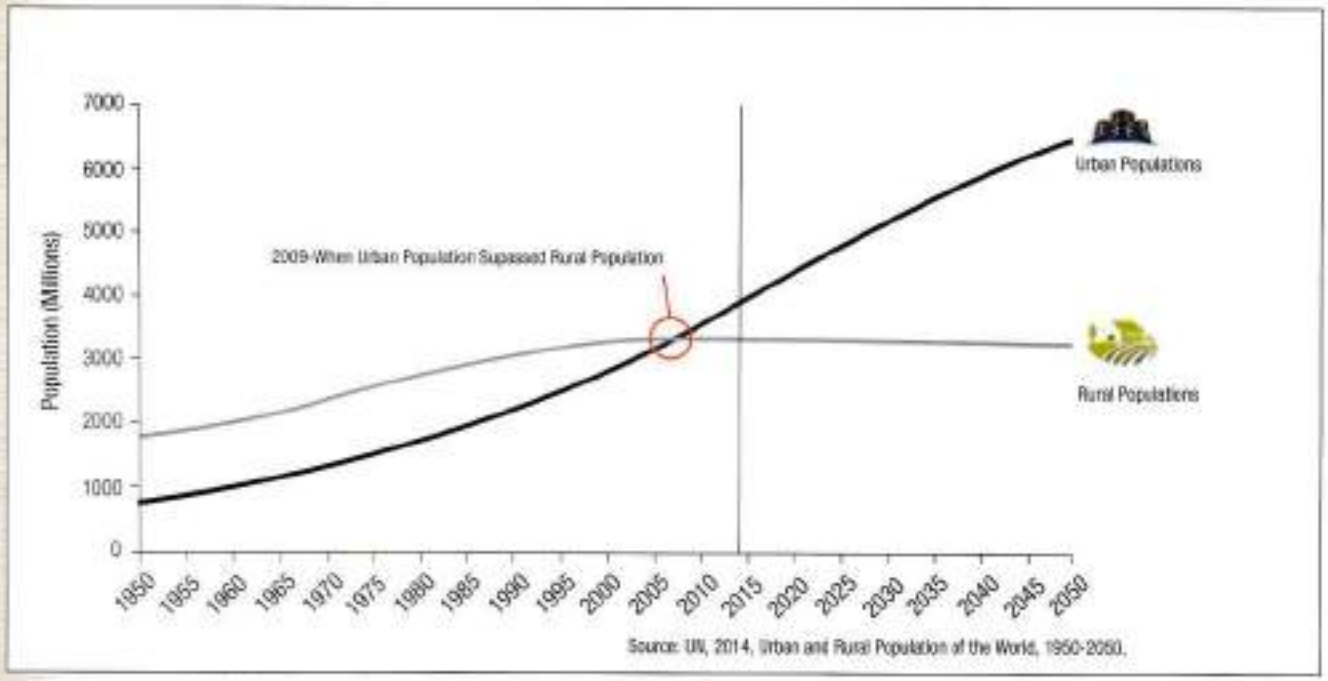

চিত্র ১ : বিশ্বব্যাপী শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ প্রাক্কলন।

কার্বনের শূন্য/স্বল্প নিঃসরণের গুরুত্ব ও সুবিধাসমূহ

কার্বনের শূন্য/স্বল্প নিঃসরণের গুরুত্ব ও সুবিধাসমূহকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার জন্য OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development)-এর প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত ও আংশিক পরিবর্তিত নিম্নের চিত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে। চিত্রটি দেখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কার্বনের শূন্য/স্বল্প নিঃসরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও গৃহীত পদক্ষেপ থেকে সৃষ্ট কার্বন শূন্য শহর খাদ্যের নিশ্চয়তা, শিক্ষার নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা।

জ্বালানির নিশ্চয়তা, এবং দরিদ্রতা দূরীকরণ সম্যক ভূমিকা পালন করতে পারে। চিত্রটিতে আরও দেখানো হয়েছে যে, কার্বন শূন্য শহরের মাধ্যমে সৃষ্ট সুবিধাসমূহ SDG এর ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৭ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

কার্বনের শূন্য/স্বল্প নিঃসরণ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের করণীয়

OECD থেকে সংগৃহীত চিত্র-২ এ উল্লিখিত শূন্য/স্বল্প কার্বন নিঃসরণ এবং কার্বনর প্রতিরোধী অবকাঠামো নির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকার কর্তৃক গৃহীত মেগা প্রকল্পগুলো সঠিক সময়ে ও দক্ষতার সাথে শেষ করা গেলে, শূন্য/স্বল্প কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, OECD-এর Frameworkটিতে "গণপরিবহণের আধিক্য ও Mass Rapid Transit

চিত্র ২ : নিম্ন কার্বন নিঃসরণের সুফল সমূহ ও SDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

System-এর উপস্থিতির" কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে "ঢাকা মেট্রোরেল", গাজীপুর-এয়ারপোর্ট বাস রেপিট ট্রানজিট বাস্তবায়ন শেষের দিকে, যা বাস্তবায়ন হওয়ামাত্র গণপরিবহণে আমূল পরিবর্তন আসবে। একইভাবে, Frameworkটিতে উল্লিখিত "জ্বালানি সাশ্রয়ী ভবন, গণপরিবহণ ও বিকেন্দ্রীভূত নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ"-এর অংশ হিসেবে শহর এলাকায় নির্মিত ভবনসমূহের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (যদিও এর বাস্তবিক প্রয়োগ এখনো নিশ্চিত করা যায় নি)। এছাড়াও জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন গ্রিডে নবায়ন যোগ্য জ্বালানির শতকরা পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্যে বিদ্যুতের উৎস হিসেবে সোলার বিদ্যুৎ, পানি বিদ্যুৎ, ও বায়ুবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে।

নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম বা উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই শিল্প বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে, আর Side Effects হিসেবে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অতীত ইতিহাস তারই প্রমাণ বহন করে। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নগরায়ণে শূন্য/স্বল্প কার্বন নিঃসরণের বিষয়টিকে যেভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন হলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কার্বন শূন্য পৃথিবী ও নগরায়নের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ককে সমানুপাতিক সম্পর্কে পরিণত করতে সক্ষম হবে।

Comparative Analysis of Conventional Septic Tank and Sewage Treatment Plant (STP) System: Contribution in reducing Carbon Foot Print

Mosleh Uddin Ahmed[1]

1.0 Septic Tanks

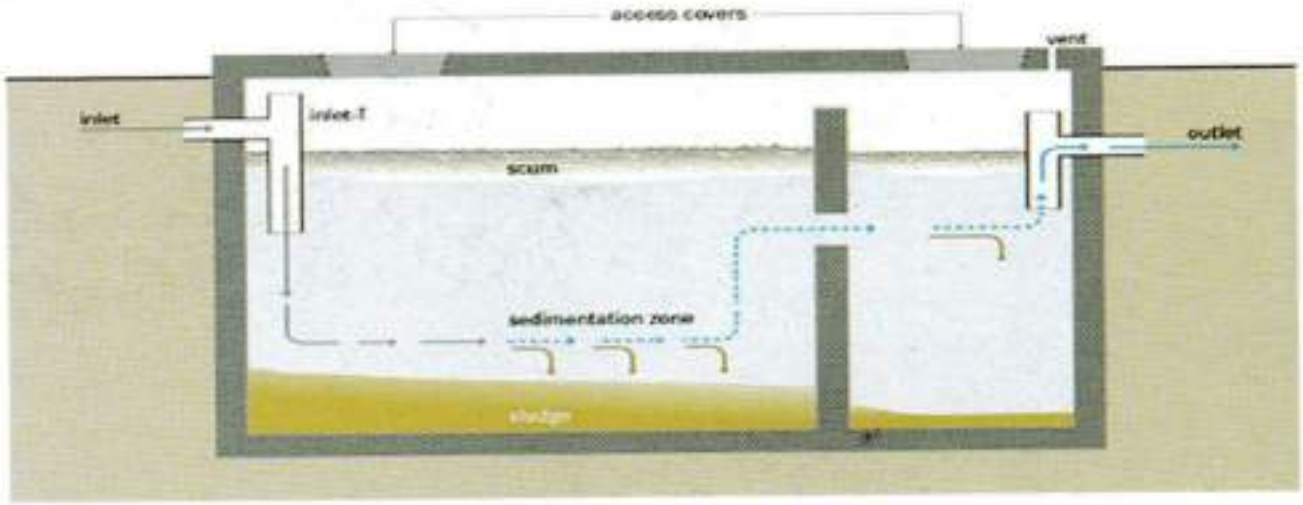

A septic tank is an underground chamber made of concrete or brickworks through which domestic wastewater (sewage) flows for basic treatment. Settling and anaerobic processes reduce solids and organics, but the treatment efficiency is only moderate.They can be used in areas that are not connected to a sewerage system. The treated liquid effluent is commonly disposed in a septic drain field, which provides further treatment. Nonetheless, groundwater pollution may occur and can be a problem.They are step up from a chamber, which can only store waste and must be emptied in a regular interval. Septic tanks are single or multi-chamber designs, utilize gravity to separate the liquid waste from the solid waste. The liquids flow out of the tank into a soak well or drainage field where they are dispersed into the soil, allowing naturally occurring aerobic (waste-degrading) bacteria to break down any remaining waste. The lighter solids, along with oil and grease, floats to the surface, while the heavy solids sink to the bottom of the tank where some of the sludge is broken down by natural bacteria. However, because much of the solid waste will remain and build up over time, a septic tank will still need emptying at regular

[1]F-10049 (IEB), Additional Chief Engineer, Dhaka PWD Zone, Dhaka

intervals. A septic tank can only be suitablefor the limited number of people and not permitted in the Groundwater Source Protection Zone.

2.8 Sewage Treatment Plants

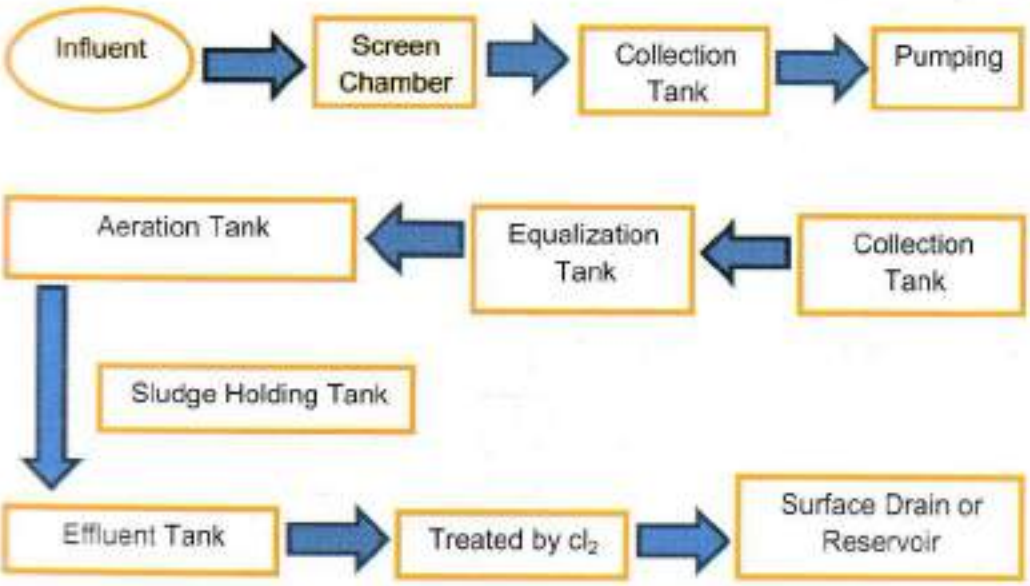

On the other hand, a Sewage Treatment Plant is an evolution of septic tank design. They essentially do the same thing; separating liquid waste from solid waste and discharge into a soak away. However, sewage treatment plants add an important extra stage in a process that makes the effluent discharge substantially cleaner and less harmful to the environment.

This is generally achieved through a three stage process. The first stage is the same as that of a septic tank, sewage and waste water enters a holding chamber where gravity separates the solids from the liquids. The liquid then flows into a second chamber, leaving the solid waste behind. The second stage then involves the introduction of oxygen into the system via an air pump or blower. This encourages the growth of aerobic bacteria which works to break down the remaining sewage into a cleaner effluent within the tank. This bacteria infused liquid then flows into a final chamber where the bacteria, having done its job, is allowed to settle to the bottom (for recycling back into the first chamber) before the clean effluent is discharged. This discharge can be into a soakaway. Moreover, further filtration or chlorination is done in order to get cleaner effluent, which is stored in reservoir for use in toilet flash/garden/car wash etc. Though there are many variations in design, all sewage treatment plants follow the main principles of this three stage process to ensure the discharged waste is as harmless as possible. This makes them suitable for the majority of sites, from small domestic houses to larger housing or commercial

premises. It is considered as better environmentally friendly option. However, theyneed some additional features, e.g.Electricity Connection, Regular Maintenance and Higher Initial Cost.

3.0 Which system is best: a Septic Tank or STP

There is no clear cut option of choosing between a septic tank and sewage treatment plant; it depends on circumstances, cost, permit requirements and site restrictions. A new sewage treatment plant cost more to install, produce cleaner effluent and need an electrical connection, but require less emptying. Septic tanks initially cost less, but need more space, more regular emptying and can't discharge into a watercourse. The most important thing isthe BNBC obligation.

4.0 Comparison of the of the Sewage Drainage Systems

	Modern Sewage Treatment Plant	Non-effluent tank (Septic Tank)
Advantages	❖ modern, eco-friendlysolution ❖ low power consumption ❖ high quality of treated sewage, ❖ the waste is dispose dunce a year most of the time ❖ resistance to aggressive sewage ❖ resistance to mechanical damage ❖ reuse the water for gardening,flushing and car washing, ❖ helps to grow green growth which absorbs more CO_2, reduce carbon foot print, ❖ Cooling earth surface ❖ save water and save energy	❖ simple in salvation ❖ resistance to depressurization due to the action of aggressive sewage ❖ resistance to mechanical damage, crushing resulting from high weight and displacement by action of ground waters, ❖ relatively low investment cost
Disadvantages	❖ possible odor-related nuisances if the plant is operated in correctly ❖ need forservicing ❖ high investment costs ❖ possible clogging of the drain or the drain well ❖ odor-related nuisance when the deposits are pumped out ❖ noise-related nuisance when the deposits are pumped out	❖ incomplete resistance to corrosion ❖ nonresistance to mechanical damage ❖ high costs of deposit disposal ❖ needforfrequentdisposalofsewage ❖ possible puncture of these ptictank ❖ odor-related nuisance

5.0 Waste water treatment contribution in reducing carbon footprint

Waste water can be a source of methane (CH_4) when treated or disposed anaerobically or when dissolved CH4 enters aerated treatment systems. It can also be a source of nitrous oxide (N_2O) emissions. Carbon dioxide (CO_2) emissions from waste water are also considered where fossil organic carbon is present in waste water or treatment sludge.

Wastewater in closed underground sewers likely generates CH_4, but there are insufficient data available to quantify the emissions from these collection systems. However, research shows that significant amounts of CH_4 can be formed within closed sewer collection systems and enters centralized wastewater treatment plants as dissolved CH_4 in the waste water, where it is then emitted during treatment.

4.03 Total Greenhouse GasEmissions (GHG):

The Greenhouse gas (CO, CO_2, CH_4, N_2O, CFC etc)emissions (carbon footprint) from both microbiological processes and energy use have been known from different laboratory test and research. In order to estimate the average total emissions (as CO_2equivalent) for the different treatment plant, some test reports/literatures have been reviewed. The results show that average GHG emissions from a septic tank systems with 164.5 kg CO_2/year are higher than those from a secondary treatment system which are estimated to be on average 144.0 kg CO_2/year.In the densely populated urban areas, it is estimated that the total annual GHG emissions related to all waste water treatment plant is estimated to be 89.8% related to septic tank systems and 10.2% to secondary treatment systems(Ref: www.mdpi.com/journal/sustainability, 2014).

তাপমাত্রা ও কার্বন নিঃসরণের হার হ্রাসে ছাদবাগানের ভূমিকা

শাহানা সুলতানা[১]

নগরায়ণের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে যেয়ে আজ সবুজ বিলুপ্তপ্রায়। আর এই সবুজবিহীন পৃথিবী, মূলত নগর ও শহর সম্মুখীন হচ্ছে বিভিন্ন সমস্যার যার মধ্যে অন্যতম হল উচ্চ তাপমাত্রা । প্রতি বছর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রা, আর তার সাথে বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। এই জীবাশ্ম জ্বালানি পুনরায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। অনেক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী ছোট শহর বা গ্রামের গিয়ে বড় শহরগুলোতে তাপমাত্রা বেশি যাকে একাডেমিক ভাষায় আরবান হিট আইল্যান্ড (UHI) বলা হয় । এর কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখা যায় অভেদ্য কংক্রিট দ্বারা নির্মিত অবকাঠামো, শিল্পকারখানা, এবং যানবাহন যা কি না শহরে বসবাসরত মানুষজনকে সেবা প্রদান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তৈরি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। প্রথমত, শহরে যেসব নির্মাণকার্য হয়, তার জন্য বৃক্ষনিধন ও জলাশয় ভরাট করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। তৃতীয়ত, এসব কংক্রিট নির্মিত অবকাঠামো সূর্য থেকে অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে কিন্তু প্রতিফলন করে কম যা পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি করে। অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বড় শহরগুলোর মতো ঢাকা শহরেও বিগত বছরগুলোতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা শহরে বার্ষিক গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৮০ সেলসিয়াস ও ২৪ ০ সেলসিয়াস যা ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ২৩ ০ সেলসিয়াস এবং ৩২ ০ সেলসিয়াস । একইভাবে, ১৯৮৯ সালে ঢাকা শহরে গাছপালা ছিল শহরের ২০ শতাংশ যা কমে ২০০২ সালে ১৫.৫ শতাংশ এবং ২০১০ সালে ৭.৩ শতাংশ হয় । বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছে গাছপালা ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমিয়ে দৈনিক মাথাপিছু এনার্জির চাহিদা (Energy demand) কমায় । এহ্রাসকৃত চাহিদা প্রভাবিত করে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং জীবাশ্ম জ্বালানির কম ব্যবহার পরিবেশে কার্বন নিঃসরণ কমায়।

যেহেতু শহরাঞ্চলে মানুষ বসবাস করতে চায় ভালো কর্মসংস্থান, বেশি আয় ও উন্নত জীবনযাপনের আশায়, সেহেতু মানুষকে শহরবিমুখী করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আবার শহরের ভূমির পরিমাণ সীমিত থাকায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমতবস্থায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাসার ছাদকে বৃক্ষরোপণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকা শহরেও ঘনবসতির দরুন খোলা জায়গা পাওয়া কঠিন এবং বাসাবাড়ির ছাদ বৃক্ষরোপণের জন্য হতে পারে উপযুক্ত স্থান। ছাদবাগান অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, শক্তি সম্পদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহাররোধকরণসহ তাপমাত্রা ও কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ এ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলো আমলে নিয়ে ঢাকা শহরের আজিমপুর আবাসিক এলাকায় ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে একটি গবেষণা করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ছাদবাগানের ভূমিকা কতটুকু তা দেখা। উক্ত গবেষণায় দশটি আবাসিক ভবনে, যার মধ্যে পাঁচটি ছাদবাগানসহ ও পাঁচটি ছাদবাগানবিহীন, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা ব্যবধানে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

[১] সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিল্ডিংগুলো মোটামুটি একই পরিমাণ জমিতে এবং তলাবিশিষ্ট ছিল। যেহেতু ছাদপৃষ্ঠ ও বিল্ডিং-এর উপর তলা সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা গ্রহণ করে, এই দুই তলা থেকে তাপমাত্রাসমূহ রেকর্ড করা হয়।

ফলাফল থেকে পাওয়া যায় যেসব ক্ষেত্রে বাগান সংবলিত বিল্ডিং-এর ছাদ ও উপরতলার তাপমাত্রা অন্যদের তুলনায় কম এবং ছাদের তাপমাত্রা উপরতলার চেয়ে বেশি। ছাদবাগানসমূহ বিল্ডিং-এর ছাদের মোট আয়তনের অর্ধেকজুড়ে বিস্তৃত এবং এ পরিমাণ বাগান ছাদ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে ১.৮৬০ সেলসিয়াস এবং ছাদের নিচতলার (টপ ফ্লোর) তাপমাত্রা গড়ে ১.৬১০ সেলসিয়াস হ্রাস করে। এমনকি, সবুজ বিল্ডিং-এর ছাদ পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাগানবিহীন বিল্ডিং-এর উপরের তলার তাপমাত্রার চেয়েও কম। যদিও ছাদ সূর্যের আলো অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণ করে, ছাদবাগানের গাছপালা ছায়া প্রদান করে, গাছের পাতা অতিরিক্ত সূর্যের আলোকে শোষণ করে যা পৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে প্রশমিত করে। আবার, গাছের জন্য টবে যে মাটি ব্যবহৃত হয় তাও তাপ শোষণ করে। একই সাথে, গাছপালার জন্য যে বহমান বাতাস তৈরি হয়, তাও বিল্ডিং-এর তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে। বিপরীতভাবে, বাগানবিহীন ছাদের নিম্ন অ্যালবেডো সূর্যের তাপ অনেক বেশি শোষণ করে যা উপরিভাগের তাপমাত্রা বাড়ায়। ছাদের তাপমাত্রা তার নিম্নের তলাকে প্রভাবিত করে বলেই বাগানবিহীন দালানের উপরতলার তাপমাত্রা সবুজ বিল্ডিং-এর উপর তলার চেয়ে বেশি হয়। গবেষণাটি আরও প্রকাশ করে যে ছাদবাগান ছাদের তাপমাত্রা কমাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর দুপুর ১২টায় যখন দুই ধরনের বিল্ডিং-এর মধ্যে তাপমাত্রার ব্যবধান সর্বোচ্চ। তবে উপর তলার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে ছাদবাগান দুপুর ৩টায় অধিক কার্যকর। সকাল বা বিকালে সূর্যের তাপ কম থাকায় তখন দুই ধরনের বিল্ডিং-এর মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকে এবং ছাদবাগানও তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না। তবে উভয় বিল্ডিং-এর উপর তলায় সকালের চেয়ে বিকালে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বেশি থাকে যার জন্য মূলত বাসার অভ্যন্তরে নিম্ন বায়ু সঞ্চালন দরুন তাপ আটকে যাওয়া দায়ী। যেসব বিল্ডিং-এ ছাদবাগান আছে, তাদের ক্ষেত্রে দৈনিক তাপমাত্রার ওঠানামাও কম। সুতরাং, যখন গৃহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কম থাকে, তখন শীতলকরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতাও কমে যায় যা কিনা কার্বন নিঃসরণে ভূমিকা রাখে।

চিত্র-১ : তাপমাত্রা রেকর্ড ও ছাদবাগান (সমীক্ষা, ২০১৭)

পরিশেষে বলা যায়, ছাদবাগান ভবনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ছাদবাগানের অতি ব্যবহার শহরের বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রাকেও প্রভাবিত করতে পারে। যখন পরিবেশের তাপমাত্রা কমতে থাকবে, মানুষের জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ও হ্রাস পাবে। অর্থাৎ সবুজ ছাদবাগান জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে কার্বন নিঃসরণের হারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমতাবস্থায়, সব ধরনের ভবনে, হোক তা আবাসিক বা অনাবাসিক, ছাদবাগান পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সাধারণ জনগণকে ছাদবাগান করার জন্য উৎসাহ দিতে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে যারা ভবনে বাগান করবে তাদের ১০ শতাংশ ট্যাক্স মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন ধরনের ঘোষণা শহরাঞ্চলে সবুজায়ন বৃদ্ধি করে কার্বন নিঃসরণের হার হ্রাস করতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

References

1. Ahmed, B. et al. (2013). Simulating Land Cover Changes and Their Impacts on Land Surface Temperature in Dhaka, Bangladesh. Remote Sensing, 5: 5969-5998.
2. Rosenthal, J. et al. (2003). One hundred years of New York City's "urban heat island": temperature trends and public health impacts. Eos Trans. AGU, 84(46), Fall Meet. Suppl., Abstract U32A-0030.
3. Tian, G. et al. (2005). Analysis of spatio-temporal dynamic pattern and driving forces of urban land in China in 1990s using TM images and GIS. Cities, 22(6): 400-410.
4. BMD (2012). Temperature Data. Bangladesh Meteorological Department, Dhaka.
5. Rahman, S. et al. (2011). Temporal change detection of vegetation coverage of Dhaka using Remote Sensing. International Journal of Geomatics and Geosciences, 2 (2): 481-490.
6. Du, H., Wang, D., Wang, Y., Zhao, X., Qin, F., Jiang, H., & Cai, Y. (2016). Influences of land cover types, meteorological conditions, anthropogenic heat and urban area on surface urban heat island in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration. Science of the Total Environment, 571, 461-470.
7. Islam, K.M. (2004). Rooftop Gardening as a Strategy of Urban Agriculture for Food Security: The Case of Iaka City, Bangladesh. Proc. IC on Urban Horticulture 241-247.
8. Jaffal, I., Ouldboukhitine, S.E., and Belarbi, R. (2011). A comprehensive study of the impact of green roofs on building energy performance. Renewable Energy, 43: 157-164.
9. Madre, J.S. and Lundholm, J. (2011). Performance evaluation of native plants suited to extensive green roof conditions in a maritime climate. Ecological Engineering, 37: 407–417.

একটি কার্বন-ফ্রি পৃথিবী ও স্থপতিগণের উদ্যোগ

স্থপতি মো. নাফিজুর রহমান[১]
স্থপতি শেখ ইতমাম সউদ[২]

ভূমিকা

প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন ঢাকার বর্তমান মোট আয়তন ১৪৫ বর্গ কিলোমিটার (সিটি কর্পোরেশন এলাকা) তবে প্রস্তাবিত ড্যাপ ২০১৬-২০৩৫ অনুযায়ী এ মহানগরীর মোট আয়তন ৩০২ বর্গকিলোমিটার। ঢাকাতে এককভাবে দেশের প্রায় ৩৭% শহুরে জনগণ বসবাস করে। ঢাকার এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও একই হারে অন্যান্য ছোট শহর ও নগরগুলোতে সুবিধা সৃষ্টি বিলম্বিত হলে এটি ৫০% ভাগে বৃদ্ধি হতে পারে যা ঢাকাকে প্রকৃতপক্ষে একটি বসবাস অযোগ্য নগরীতে পরিণত করতে পারে। তবে আশার কথা সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশের সকল এলাকাতে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং গ্রাম পর্যায়ে শহরের ন্যায় সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে "আমার গ্রাম আমার শহর" কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এলক্ষ্যে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় পর্যায়ে সকল ইউনিয়ন ও পৌর এলাকাতে আরো অধিক নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম আমার শহর" গ্রাম পর্যায়ে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। তবে সরকারের এই ভিশন বাস্তবায়নে স্থপতি সমাজকে পেশাগত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা দিয়ে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট সক্রিয় অংশগ্রহণে সরকারের "আমার গ্রাম আমার শহর" কার্যক্রম আরো অধিক দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব।

কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বিদ্যমান বিধি বিধান ও পলিসি

স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট তার দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে এবং সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০০৮ সালের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এক্ট ১৯৫২-এর আওতায় ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ ও অপসারণ বিধিমালা প্রণয়নে সহায়তা করে। দেশে এই প্রথম কোনো বিধিমালা স্থপতিসহ পেশাজীবীদের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) ২০১০ সালে হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং তা হালনাগাদ প্রক্রিয়ার শুরুতে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠন ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

BNBC ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালাতে ফ্লোর এরিয়া রেসিও (FAR) ও ম্যাক্সিমাম গ্রাউন্ড কাভারেজের (MGC) যে বিধান সংযোজন করা হয়েছিল তার দ্বারা পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ করা সহজতর। তবে এলাকা ভেদে ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় FAR-এর মান নির্ধারণের মাধ্যমে জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এছাড়াও বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত ডিজাইন প্রতিযোগিতায় বিকল্প জ্বালানি, জ্বালানির দক্ষতা এবং নেট জিরো কার্বন বিল্ডিং বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান প্রশংসার দাবি রাখে। ফলস্বরূপ তরুণ স্থপতিরা জ্বালানি শক্তির অপচয় রোধ ও তার বিকল্প ব্যবহার এবং বিল্ডিং নির্মাণ সামগ্রীর বিকল্পতা নিয়েও ডিজাইনগুলোতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করছেন। উচ্চশিক্ষায় জ্বালানি শক্তির দক্ষতা, পরিবেশগত দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে পড়া-শোনার আগ্রহ প্রচুর বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট UIA-এর SDG ২০৩০ অর্জনের লক্ষ্যে একাত্মতা ঘোষণা করেছে এবং তা নিয়ে সর্বদা কাজ করে চলেছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় স্থপতিদের মধ্যে কার্বন-ফ্রি উদ্যোগগুলো এবং পরিবেশের প্রতি আরও যত্নশীল হওয়ার উদ্যোগগুলো আকর্ষণীয় ও বিশেষ বিবেচনার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে।

[illegible] পরিচালক ও সম্পাদক, ২ স্থপতি শেখ ইতমাম সউদ
[illegible] প্রকাশনা ও প্রচার, বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট

আমাদের অভিজ্ঞ স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদগণ সিটি মেয়রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে শহরের বেদখলকৃত বা অবাঞ্ছিত নাগরিক উন্মুক্ত স্থানগুলোকে নতুন করে পুনর্জীবিত করছেন। সেখানে লো-কার্বন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করছেন এবং প্রচুর গাছপালা রাখার চেষ্টা করছেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বাইসাইকেল লেন তৈরি করা হচ্ছে এবং তার প্রভাব স্বরূপ শহরে সাইকেল চালকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। শহরের রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলোর এলইডি বাতিতে পরিবর্তন করা শুরু হয়েছে। শহরের ময়লা আবর্জনাগুলোকে আগের মতো রাস্তার উপর ডাস্টবিন বানিয়ে সংগ্রহ না করে ময়লার ডিপো তৈরি করা হয়েছে এবং সেগুলো উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো সব উদ্যোগ নাগরিক জীবনকে আরো সুন্দর ও নির্মল করে তুলছে। কিন্তু উদ্যোগগুলো বিচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে। অথচ উদ্যোগগুলো যদি একটি সামগ্রিক মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় তা হলে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরগুলোকেও কার্বন নিরপেক্ষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় ।

প্রস্তাবিত Detail Area Plan (DAP) ২০১৬-২০৩৫ এ বর্তমান ঢাকা শহরের জন ঘনত্ব হ্রাস করার উদ্যোগে ভবনসমূহের উচ্চতা এই FAR I MGC বিষয়গুলোকে আরো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রস্তাবিত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় ভবনের যে উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হয়েছে তা নির্মাণে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং ফলশ্রুতিতে অনেক জমির মালিক নতুন ভবন নির্মাণে আগ্রহী হবেনা যা স্থপতিদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করতে পারে।

প্রযুক্তির উন্নয়নে নগর পরিকল্পনার নতুন নতুন নিয়ামক সংযুক্ত হয়। বিগত এক দশকে প্রযুক্তির দ্রুত ও ব্যাপক উন্নয়নের ফলে ২৫ বছরের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা মাত্র ৫/৬ বছরে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করতে হয়। বিশ্বের নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে তা ব্যাপক হারে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ আলোকে সরকার ভবনের ছাদ হতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে নেট মিটারিং পলিসি প্রণয়ন করেছে। ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা শহরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে ভবনের ছাদ খুবই উপযুক্ত। তাই নগর পরিকল্পনায় এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বাচল উপশহরের ভবনসমূহের উচ্চতার ক্রম প্লটের অবস্থান অনুযায়ী (উত্তর-দক্ষিণ) নির্ধারণ করা গেলে প্রায় সকল ভবনের ছাদ হতে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া প্রস্তাবিত উঅচ এ বন্যাকবলিত জমিসমূহ রক্ষার্থে সেখানে সোলার পার্ক নির্মাণের সুযোগ রাখলে তা জমিরধরণ পরিবর্তন ব্যতিরেকেই জমির মালিক অর্থনৈতিকভাবে বিপুল লাভবান হতে পারবে। ঐ সকল জমির মালিক নীচু জমি ভরাট না করে তা সোলার পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে। উল্লেখ্য যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনায় ফ্লাড-ফ্লো-জোনকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে ময়মনসিংহ শহরকে অধিক পরিবেশবান্ধব শহর হিসেবে চিহ্নিত করবে।

নগরায়ণে অর্থনীতির প্রভাব

বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে হার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ঢাকার পাশাপাশি ছোট ছোট শহরেও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে ঢাকার সাথে পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগ বৃদ্ধিও কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকার মধ্যেও মেট্রোরেলসহ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে। এছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাতে শিল্প ও কলকারখানা গড়ে উঠেছে। যা স্থানীয় পর্যায়ে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে এবং আশা করা যায় এতে ঢাকামুখী মানুষের পরিমাণ হ্রাস হবে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগীয় শহর এবং জেলা শহরে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিটি খাতে ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। যেখানে ইতোমধ্যে চীন, জাপানসহ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট হচ্ছে। এ সকল অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক জনবলের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। সুতারাং, অদূর ভবিষ্যতে ঢাকাতে বর্তমানের যে জনস্রোত তা উল্লেখ যোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে ঢাকাসহ যে কোনো নগর পরিকল্পনার সময় শুধু স্থানীয় সকল দিক বিবেচনা না করে সরকারের দেশব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হারও বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। দেশের সর্বত্র বর্তমানের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই ঢাকামুখি জনস্রোত হ্রাস পাবে এবং আমাদের ঢাকা শহরের বিশদ মহাপরিকল্পনায় জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রণে ভবনের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের ও প্রয়োজন হবে না। ২০২১ সালের মধ্যে পদ্মা বহুমুখী সেতু চালু হলেই ঢাকা শহরের জনসংখ্যা হ্রাসের প্রভাব পড়তে শুরু হবে এবং তা আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে একটি স্থির রূপ লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার

বিগত ৫০ বছরে আমাদের যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যে আর্থ-সামাজিক সচ্ছলতা এসেছে এবং যে উন্নয়নের ধারা ধরে আমরা এগুচ্ছি তাতে আমরা প্রত্যেকটি সেক্টর থেকে পরিবেশের উপর কার্বন-ধনাত্মক প্রভাব ফেলেছি। যার বিরূপ প্রভাব আমরা এখন প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। তাই জাতির জনকের জন্মশতবর্ষে এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর লগ্নে আমাদের প্রত্যেকটি পেশার লক্ষ্য হতে হবে কার্বন-নিরপেক্ষতা থেকে কার্বন-ঋণাত্মকতার দিকে সমাজকে তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এর জন্য দরকার সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ যা কি না একটি সামগ্রিক মহাপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে। এভাবেই একদিন জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশটি আমাদের দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

টেকসই নগরায়ণে রাজউকের অবদান

মুহম্মদ কামরুজ্জামান[১]

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
[ছাড়পত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য]

[illegible] জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণসহ বাসযোগ্য ও নিরাপদ আবাসস্থলের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ [illegible] সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Accelerating urban action for a carbon-free world- [illegible] কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'।

[illegible]ABITAT এর মতে, বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ্বব্যাপী শহুরে জনসংখ্যা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। অতীতের তুলনায় চারগুণেরও বেশি মানুষ এখন শহুরে পরিবেশে বসবাস করছেন। ফলশ্রুতিতে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর ঘনত্ব (যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের একটি প্রধান [illegible]) প্রায় এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বেড়েছে। আধুনিক শহরগুলো বিশ্বের শক্তির প্রায় ৭৫% ব্যয় এবং বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ৭০% এর জন্য দায়ী। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বজায় রাখার একটি চাবিকাঠি হলো পরিকল্পিত নগরায়ণ, যা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যারিস চুক্তি ২০১৫ এর একটি লক্ষ্যমাত্রা।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা প্রশাসনিকভাবে ঢাকা জেলার প্রধান শহর। ভৌগোলিকভাবে এটি বাংলাদেশের মধ্যভাগে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে একটি সমতল এলাকাতে অবস্থিত। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির শহর এবং ভৌগোলিকভাবে অতিমহানগরী বা মেগাসিটি। ঢাকা মহানগরী এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ। জনসংখ্যার বিচারেও ঢাকা দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম শহর। জনঘনত্বের বিচারে এটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। ৩০৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় ২৩ হাজারের অধিক লোক বাস করে। আধুনিক ঢাকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় সারা দেশ থেকে প্রচুর মানুষ ঢাকায় আসেন জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। এ কারণে ঢাকা হয়ে উঠেছে বিশ্বের দ্রুততম [illegible] নগরী।

ঢাকার জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ, বর্ষণমুখর, আর্দ্র গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং কোপেন জলবায়ু শ্রেণিবিভাগ এর অধীনে ক্রান্তীয় সমভাবাপন্ন। এই শহরের একটি স্বতন্ত্র মৌসুম রয়েছে। যানজট ও শিল্পকারখানার অপরিকল্পিত বর্জ্য নির্গমণের ফলে প্রতিনিয়ত বায়ু ও পানি দূষণ বাড়ছে। ফলে [illegible] জলবায়ু এবং জীবনমান মারাত্মক আকারে প্রভাবিত হচ্ছে। পরিকল্পিত টেকসই নগরায়ণের মাধ্যমে এ সমস্যাগুলোর হ্রাস [illegible] সম্ভব।

[illegible], রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

অপরদিকে Sustainable Development Goals (SDG)-এর ১১তম লক্ষ্য হলো "টেকসই শহর ও সম্প্রদায়"। এটি ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে একটি যা ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শহরগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, স্থিতিস্থাপক এবং টেকসই করার লক্ষ্যে SDG বিবেচনায় নিয়েছে গণপরিবহণে বিনিয়োগ, নাগরিকদের জন্য সবুজ পার্ক তৈরি, অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি।

ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও পরিবর্ধনের বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম "ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট" (DIT) প্রতিষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত তৎকালীন DIT পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে উক্ত আইন সংশোধনের মাধ্যমে "রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)" হিসেবে পরিবর্তিত হয়। ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (DIT) কর্তৃক সর্বপ্রথম ঢাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। এই প্ল্যানের আওতায় প্রাথমিকভাবে ২২০ বর্গমাইল এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পরবর্তীতে ৩২০ বর্গমাইলে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৫ সালে ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা (DMDP)-এর আওতায় ৫৯০ বর্গমাইল এলাকার কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ২০১০ সালে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিষ্কার জলাধার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজায়ন– এসকল ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রেখে পরিকল্পিত নগর তৈরির লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) এর খসড়া প্রণীত হয়েছে। কার্বনমুক্ত পৃথিবী গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত নগরায়ণ কার্যক্রমে রাজউক অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে।

টেকসই নগরায়ণে রাজউকের পরিকল্পনা

রাজউক যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করছে এবং একই সাথে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করছে। পরিকল্পিত আবাসন খাত বিকাশের লক্ষ্যে নীতিমালা, আইন, কোড ও বিধি সংশোধন/প্রণয়ন বাস্তবায়ন করছে;

টেকসই নগরায়ণ, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়ন বিষয়ে দায়িত্ব পালন এবং পরিকল্পিত নগরায়ণের লক্ষ্যে স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তুলছে। নগরায়ণ এবং আবাসন সমস্যা সমাধানে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে;

ইমারত নির্মাণ, নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত পলিসি প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, বিধিমালা প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়ন করছে।

টেকসই নগরায়ণে রাজউকের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

রাজউকের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে সম্প্রতি ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

রাজউকের ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ৬টি নিজস্ব অর্থায়নে, ৬টি GOB ও বৈদেশিক সাহায্যভুক্ত এবং ২টি PPP প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

GOB ও বৈদেশিক সাহায্যভুক্ত প্রকল্প

- গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।
- কুড়িল-পূর্বাচল ১০০ ফিট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প : রাজউক অংশ।
- হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্প।
- মাদানী এভিনিউ সম্প্রসারণ প্রকল্প ও উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।

নিজস্ব অর্থায়ন প্রকল্প

- পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প।
- উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্প।
- উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প।
- ঝিলমিল প্রকল্পে আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
- ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডিতে ৯টি পরিত্যাক্ত বাড়িতে এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প।
- ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়ন প্রকল্প।

PPP প্রকল্প

- পূর্বাচল পানি সরবরাহ PPP প্রকল্প।
- বিলমিল রেসিডেন্সিয়াল পার্ক প্রকল্প।

ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহ

- তেরনীগঞ্জ মডেল টাউন প্রকল্প।
- তুরাগ নদের বন্যা প্রবাহ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।
- জলাশয় সংরক্ষণ ও কমপ্যাক্ট টাউনশীপ উন্নয়ন প্রকল্প।
- পূর্বাচল নতুন শহর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত সংযোগ সড়ক প্রকল্প।
- রাজউক পূর্বাচল হাই রাইজ এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প।
- শেখ রাসেল ওয়াটার বেইজ বিনোদন পার্ক প্রকল্প।
- পুরান ঢাকার আরবান রিডেভেলপমেন্ট প্রকল্প।

রাজউক সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকাটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন টাউনশিপ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট আয়তন ৬১৫০ একরের আবাসিকের জন্য ব্যবহৃত ৩৮.৭৪% জমি, রাস্তার জন্য ২৫.৯%, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিকের জন্য ৬.৪১%, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পার্কের জন্য ৩.২%, শহরে সবুজ ও উন্মুক্ত জায়গার জন্য ৬.৬%, হ্রদ ও খালের জন্য ৭.১%, খেলাধুলার জন্য ২.৫%, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক অবকাঠামোর জন্য ৬% বরাদ্দ রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজউক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের আবাসনের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে ঢাকা শহরের আশপাশে বেশ কয়েকটি বহুতল আবাসিক কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য নির্মিত ২১৪.৪৪ একর আয়তনের উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পটি দেশের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প। সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৫৫% ভূমি খেলার মাঠ, পার্ক, সবুজায়ন, রাস্তা ইত্যাদির জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এসটিপি) ইতোমধ্যে প্রতিটি ভবনে এবং কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো ব্লকের প্রতিটি ক্লাস্টারের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। সকল পরিষেবা লাইন (পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, ক্যাবল টিভি, টেলিফোন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি) ভূগর্ভস্থ হবে। গাড়ি পরিষ্কার, বাগান এবং গ্রাউন্ড রিচার্জিং এর জন্য প্রতিটি ভবনে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণে অবস্থিত বিলমিল আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পটি ২১৫.৩১ একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত, যেখানে ১৪ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। প্রকল্প এলাকাটির মধ্যে প্রাকৃতিক খাল সংরক্ষণ করা হয়েছে। খেলার মাঠ, পার্ক, সবুজায়ন ও রাস্তার জন্য প্রকল্পে বিরাট একটি অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পে ৩০০০টি বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন এবং লেকের পানির জলজ পরিবেশের গুণগতমান উন্নয়ন করা হয়েছে। ঢাকা শহরের উত্তরা আবাসিক এলাকার ৬৩ একর জায়গা নিয়ে উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি লেকসমূহ বেদখল হওয়া থেকে রক্ষা করা, দূষণমুক্ত করা, লেকে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে মহানগরীর নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসে ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১-এর প্রতিপাদ্য Accelerating urban action for a carbon-free world– 'নগরীয় কর্মপন্থা প্রয়োগ করি কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়ি'। অনুযায়ী পরিকল্পিত ভবন নির্মাণ, অধিক পরিমাণে সবুজায়ন, খোলা পার্ক, পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার লেক/জলাধার, সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং পরিকল্পিত বর্জ্যব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজধানীতে বসবাসযোগ্য ও নিরাপদ টেকসই আবাসস্থল নিশ্চিতকরণে রাজউক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

নদীর বালি ব্যবহার করে Interlocking Concrete Pavement Block (ICPB) তৈরির সম্ভাবনা

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন[১] মো: আরিফুজ্জামান[২]
মো: শাহ আলম [৩] মো: নাঈম হোসাইন [৪]
মো: সাদ্দাম হোসেন [৫] তারেক রহমান [৬]

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছরই বিভিন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্যে বন্যা অন্যতম। প্রতি বছরই বন্যার ফলে নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। ফলে একদিকে যেমন স্থলভাগ কমে যাচ্ছে অন্যদিকে নদীর নাব্যতাও হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে নদী শুকিয়ে চর পড়ছে। নদীসমূহের নাব্যতা ধরে রাখার জন্য নিয়মিত নদী খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। এই নদী খননের ফলে যে বালি ও পলিমাটি উত্তোলিত হয় তা রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না অথবা নদীর তীরবর্তী এলাকায় স্তূপ আকারে রাখা হচ্ছে। পরবর্তীতে নদী ভাঙ্গনের ফলে আবার খননকৃত বালি নদীতে পরে নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই খননকৃত বালি ব্যবহার উপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই অত্র প্রতিষ্ঠান পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন প্রকারের কংক্রিট ব্লক তৈরি করেছে এবং উক্ত ব্লক এর মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে বহুল প্রচলিত পোড়ামাটির ইট ব্যাপকভাবে উৎপাদনের কারণে বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পোড়ামাটির ইট ব্যবহারের পরিবর্তে কনক্রিট ব্লক ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করেন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সরকারি নির্মাণ কাজে শতভাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই জলবায়ু পরিবর্তনের রোধে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হোন।

নমুনা তৈরি ও পরীক্ষা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাকে কঠোরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিভিন্ন রকম কংক্রিট ব্লক উৎপাদনে আরও উদ্যোগী হয়ে উঠে। এর আওতায় অত্র প্রতিষ্ঠান Interlocking Concrete Pavement Block (ICPB) ব্লক তৈরির গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে। প্রচলিত ICPB ব্লক সাধারণত সিমেন্ট, সিলেট স্যান্ড (F.M. 2.5), স্টোন ডাস্ট, নুড়ি পাথর ও পানির সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। কিন্তু সিলেট স্যান্ড ও নুড়ি পাথর অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই নুড়ি পাথর ও সিলেট স্যান্ডের ব্যবহার কমিয়ে ব্লক তৈরির ব্যয় হ্রাস করার জন্য নদী খননের বালি ব্যবহার করে ICPB ব্লক তৈরি করতে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এ গবেষণার আওতায় অত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা এবং পদ্মা নদী থেকে খননকৃত বালি সংগ্রহ করে। সংগৃহীত বালি ICPB ব্লক তৈরিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

[১]সিনিয়র রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, [২]সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, [৩] রিসার্চ এসোসিয়েট, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

এই ব্লক তৈরির ব্যবহৃত উপাদানসমূহ হলো সিমেন্ট, বিভিন্ন নদী থেকে উত্তোলিত বালি যার সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) ১.০, সিলেট স্যান্ড যার সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) ২.৫, এডমিক্সার ও পানি। ব্যবহৃত পানি ও সিমেন্ট অনুপাত ০.২৮।

এই উপাদানসমূহ দুটি অনুপাতে ক) সিমেন্ট : খননকৃত বালি সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) ১.০ : সিলেট স্যান্ড সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) ২.৫ = ১ : ১.২৫ : ১.২৫ এবং খ) সিমেন্ট : খননকৃত বালি সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) ১.০: সিলেট স্যান্ড সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) ২.৫ = ১ : ১.৫ : ১.৫

চিত্র-১: HBRI-তে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত নদীর খননকৃত বালি

চিত্র-২: HBRI-এর পাইলট প্লান্টে CPB ব্লক তৈরি

অনুপাতে মিশ্রিত করে ৬০মিমি. ও ৮০ মিমি পুরুত্বের দুই ধরনের ব্লক তৈরি করা হয়।

ফলাফল

তৈরিকৃত ব্লক ৭ দিন, ১৪ দিন, ২৮ দিন কিউরিং করার পর শক্তি পরীক্ষা করা হয়। ২৮ দিন কিউরিং করার পর ৪৯০০-৭০০০ পিএসআই শক্তি সম্পন্ন ব্লক পাওয়া যায় যা টেবিল আকারে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে।

চিত্র-৩: HBRI এ উৎপাদিত ব্লক পরিদর্শন

চিত্র-৪: HBRI এর ল্যাবে ব্লকের শক্তি পরীক্ষা

ফলাফল

তৈরিকৃত ব্লক ৭ দিন, ১৪ দিন, ২৮ দিন কিউরিং করার পর শক্তি পরীক্ষা করা হয়। ২৮ দিন কিউরিং করার পর ৪৯০০-৭০০০ পিএসআই শক্তি সম্পন্ন ব্লক পাওয়া যায় যা টেবিল আকারে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণী : ৬০ ও ৮০ মি.মি. পুরুত্বের ব্লকের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল

নদীর বালি	অবস্থান	সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M)	এডমিক্সার (মিলি)/ব্যাগ	মিশ্রনের অনুপাত	গড় শক্তি (পিএসআই)					
					৬০ মিমি পুরুত্ব ICBP			৮০ মিমি পুরুত্ব ICBP		
					৭ দিন	১৪ দিন	২৮ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	২৮দিন
মেঘনা নদী	চাঁদপুর চট্টগ্রাম বিভাগ	০.৯০	২০০	১:১.২৫:১.২৫	৪২৪০	৫১৩০	৫৬২০	৪৫৯৯	৫৪৫৬	৫৯৮৬
				১:১.৫:১.৫	২৬০৬	৩০১৬	৪০৯৬	৩৯৬৬	৪৬৩৮	৪৯৫৩
ব্রহ্মপুত্র নদী	মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ বিভাগ	১.১৫	২০০	১:১.২৫:১.২৫	৪৪১০	৫২৫৬	৫৭৫৪	৪৯৫৭	৫৪৯২	৬২৪২
				১:১.৫:১.৫	৩৯৯২	৪২৫৮	৪৭৭২	৪৫৬০	৫২৩৪	৫৪২৯
যমুনা নদী	টাঙ্গাইল ঢাকা বিভাগ	১.৩৪	২০০	১:১.২৫:১.২৫	৪৪৬৭	৫৩০৪	৫৮৮৫	৫৩২৬	৫৮৮৪	৬৪৬১
				১:১.৫:১.৫	৪৪০৯	৪৬৫৬	৫২১৪	৪৯৭২	৫৫৮৬	৬২৫৭
তিস্তা নদী	ডালিয়া নীলফামারী রংপুর বিভাগ	১.৩৮	২০০	১:১.২৫:১.২৫	৪৮৪২	৫৫০২	৫৯৮৪	৫৪৩০	৫৫৮৭	৬৩১২
				১:১.৫:১.৫	৩৬৮৭	৪০২৯	৪৫৮১	৪৫৮১	৫১০২	৫৭৫৩
পদ্মা নদী	পাকশি দিশ্বরদী, পাবনা রাজশাহী বিভাগ	১.৬৭	২০০	১:১.২৫:১.২৫	৫৬৪৩	৫৯৯৬	৬৪৫৪	৫৮৫৪	৬৪৫০	৭০৭৫
				১:১.৫:১.৫	৪৯১৬	৫৩৫৭	৫৭৩৫	৫৩৫৪	৬০৩৩	৬৫৫৪

পরীক্ষায় দেখা যায় যে, খননকৃত বালির সূক্ষ্মতা গুণাঙ্কের উপর ব্লকের শক্তি বিশেষভাবে নির্ভর করে। বালির সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে ব্লকের শক্তি বাড়ে। এছাড়া ব্লকের পুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন নদীর বালির সূক্ষ্মতা গুণাঙ্ক (F.M) বনাম ICBP ব্লক এর শক্তির সম্পর্ক নিম্নের রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো।

সারণী-২:

বালির অবস্থান	নমুনা =	৬০ মিমি পুরুত্বের ICBP ব্লক		
	অনুপাত =	(১ : ১.২৫ : ১.২৫)		
	এডমিক্সার =	২০০ মি.লি/ব্যাগ সিমেন্টে		
	F.M (Sand)	গড় শক্তি (পিএসআই)		
		৭ দিন	১৪ দিন	২৮ দিন
মেঘনা নদী	০.৯০	৪২৪০	৫১৩০	৫৬২০
ব্রহ্মপুত্র নদী	১.১৫	৪৪১০	৫২৫৬	৫৭৫৪
যমুনা নদী	১.৩৪	৪৪৬৭	৫৩০৪	৫৮৮৫
তিস্তা নদী	১.৩৮	৪৮৪২	৫৫০২	৫৯৮৪
পদ্মা নদী	১.৬৭	৫৬৪৩	৫৯৯৬	৬৪৬৫

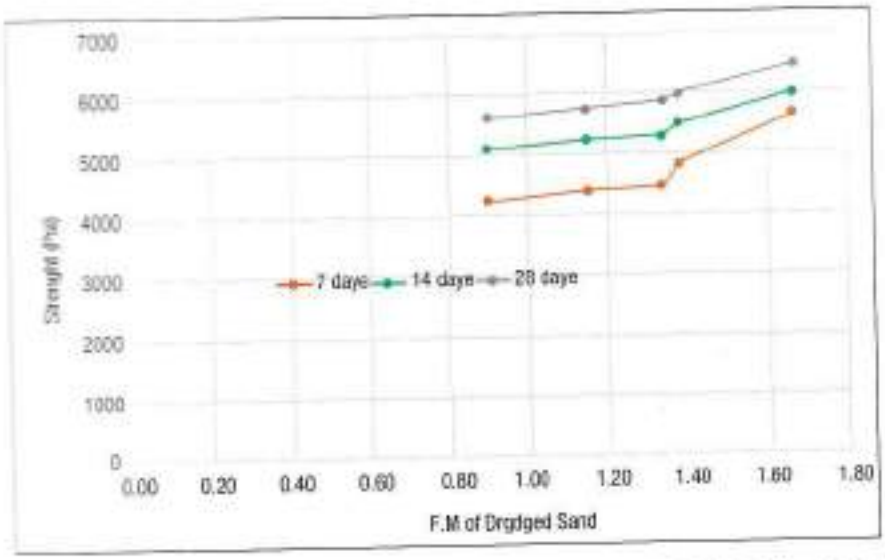

চিত্র-৫: **F.M. VS Strength (psi) for 60 mm thick ICBP with Mix Ratio 1: 1.25:1.25**

সারণী-৩:

	নমুনা =	৮০ মিমি পুরুত্বের ICBP ব্লক		
	অনুপাত =	(১ : ১.২৫ : ১.২৫)		
	এডমিক্সার =	২০০ মি.লি/ব্যাগ সিমেন্টে		
		গড় শক্তি (পিএসআই)		
বালির অবস্থান	F.M(Sand)	৭ দিন	১৪ দিন	২৮ দিন
মেঘনা নদী	০.৯০	৪৫৯৯	৫৪৫৬	৫৯৯৬
ব্রহ্মপুত্র নদী	১.১৫	৪৯৫৭	৫৪৯২	৬২৪২
যমুনা নদী	১.৩৪	৫৩২৬	৫৮৮৪	৬৪৬১
তিস্তা নদী	১.৩৮	৫৪৩০	৫৫৮৭	৬৩১২
পদ্মা নদী	১.৬৭	৫৮৫৪	৬৪৫০	৭০৭৫

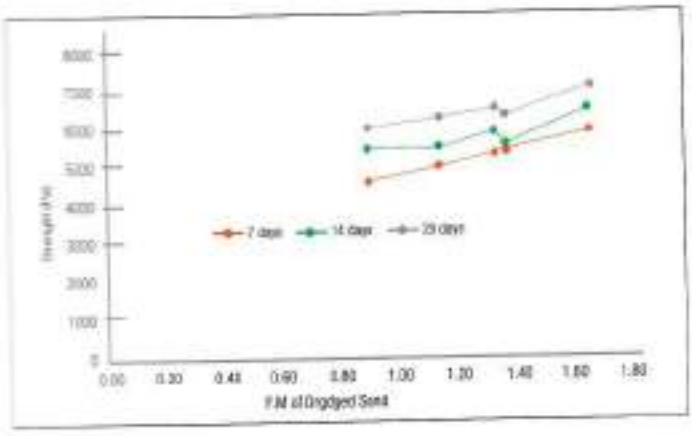

চিত্র-৬: **F.M. VS Strength (psi) for 80 mm thick ICBP with Mix Ratio 1: 1.25:1.25**

পর্যবেক্ষণ

এই গবেষণার ফলাফল হতে প্রাথমিকভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, এইচবিআরআই কর্তৃক উৎপাদিত ICPB ব্লক গ্রামীণ রাস্তা তৈরিতে যথেষ্ট ব্যবহার উপযোগী। তাই গ্রামীণ রাস্তা তৈরির কাজে এই ব্লক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন নদী খনন বালির সুষ্ঠু ব্যবহার হবে অন্যদিকে পোড়া মাটির ইটের বিকল্প তৈরি হবে। তাই এই গবেষণা ব্লক তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদানের এক নতুন দিক উন্মোচনের সূচনা করল বলে প্রত্যাশা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনে অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নেতিবাচক প্রভাব

ড. আ, ন, ম, সফিকুল আলম[১]

জলবায়ু পরিবর্তন বা 'ক্লাইমেট চেঞ্জ' বর্তমান সময়ের বহুল আলোচিত বিষয়। এর সমার্থক শব্দ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে পৃথিবীর তাপমাত্রা অতিরিক্তবৃদ্ধিকে বোঝায়। বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ, কলকারখানা- যানবাহনের ক্ষতিকারক ধোঁয়া, গ্রিনহাউস গ্যাস ইত্যাদি দিনকে দিন পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। তলিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীতে ঘটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বড় অংশ জুড়ে এখন আছে এই গ্রিনহাউস ইফেক্ট। খুব চেনা বিষয় হলেও এর সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার অভাব খুবই বেশি।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রাথমিক গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে আছে জলীয়বাষ্প,কার্বন ডাই-অক্সাইড,মিথেন,নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজোন। বায়ুমন্ডলে নির্গত ঐ গ্রিনহাউস গ্যাসের ৮০ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড, ১০ শতাংশ মিথেন, ৭ শতাংশ নাইট্রাস অক্সইড ও বাকি ৩ শতাংশ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস। বিজ্ঞানীরা ৮টি শীর্ষ কার্বন নির্গমনকারী খাত চিহ্নিত করেছেন, যেমন– বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ২১.৩%, শিল্প-কারখানা- ১৬.৮%, পরিবহণ- ১৪%, কৃষি উপজাত- ১২.৫%, জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন প্রক্রিয়াজাত ও বিপণন- ১১.৩%, আবাসিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম- ১০.৩%, ভূমি ব্যবহার ও জৈব জ্বালানি- ১০% এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিশোধন- ৩.৪%। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনকারী দেশগুলো হচ্ছে চীন, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ভারত, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশ। চীন ও আমেরিকার কার্বন নির্গমনের পরিমাণ মোট নির্গমনের প্রায় ৫০ শতাংশ। পরিবেশ দূষণকারী উপাদানগুলো উৎপাদনে বাংলাদেশের ভূমিকা অতি নগণ্য। তবুও পরিবেশ দূষণের প্রভাব বাংলাদেশের ওপর বেশি পড়ছে। এ কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং নাতিশীতোষ্ণ বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর দেশে পরিণত হচ্ছে। ভারসাম্যহীন পরিবেশের জন্য ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, নিম্নচাপ, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা, প্রচণ্ড তাপ, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিধস, লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে প্রতি বছর সুনামি, সিডর, আইলা, মহাসেন ও নার্গিসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হওয়ায় ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষ, গবাদিপশু, বন্যপ্রাণী, জলজপ্রাণী, মাঠের ফসল, পুকুর, হ্যাচারি, বাঁধসহ বিভিন্ন প্রকার স্থাপনার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

পরিমাণে কম হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন খাত থেকেও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়। ভাগাড়বা ল্যান্ডফিলে যে বর্জ্য জমে থাকে , তা থেকে উৎপন্ন হয়মিথেন গ্যাস। মিথেনের প্রধান উৎসগুলো হলো: ১. গৃহপালিত পশুর বর্জ্য, ২. প্রাণিজ ও জলজ উদ্ভিদের পচন, ৩. শস্য চাষাধীন জলাভূমি, ৪. উইপোকা, ৫. জৈব জ্বালানির দহন, ৬. ভূমিধস, ৭. প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয়, ৮. কয়লা উত্তোলন, ৯. প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র। মিথেন একটি ঘ্রাণহীন, বর্ণহীন গ্যাস। কার্বন ডাই-অক্সাইডেরচেয়ে ৮৪ গুণ বেশি তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। ফলে খুব অল্প পরিমাণে মিথেন গ্যাস অনেক দীর্ঘ সময় ধরে তাপ ধরে রাখতে পারে। এ জন্য মিথেনকে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

---

[১]ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিওমার্ক লিমিটেড

[illegible] উন্নয়নের সাথে মানবজাতির যত উপকার সাধন হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও তত প্রকট হয়ে উঠেছে। আজকের পৃথিবীতে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকৃতিকে বসবাসযোগ্য রাখা। দ্রুত নগরায়ণের সাথে বর্জ্যের পরিমাণও [illegible] বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও একই চিত্র। প্রতিনিয়ত জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের সাথে বর্জ্যের উৎপাদন হচ্ছে অধিকহারে। যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য নিয়ন্ত্রকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর মাথাপিছু ১৫০ কিলোগ্রাম এবং সর্বমোট ২২.৪ মিলিয়ন টন বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ মাথাপিছু বর্জ্য সৃষ্টির হার হবে ২২০ কিলোগ্রাম এবং সর্বমোট বর্জ্যের পরিমাণ ৪৭ হাজার ৬৪ টনে গিয়ে দাঁড়াবে, যা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে। বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কঠিন, তরল, বায়বীয়। কঠিন বর্জ্যের পরিমাণই বেশি। মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্র যখন অকেজো অথবা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন এগুলো কঠিন বর্জ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। উৎস অনুসারে কঠিন বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গৃহস্থালি বর্জ্য, শিল্প কলকারখানার বর্জ্য, শহরাঞ্চলের রাস্তার বর্জ্য , হাসপাতালে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, বিপজ্জনক বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য ও প্লাস্টিক উল্লেখযোগ্য। যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশের উপাদান ও বসবাসরত জীবের ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশের প্রধান তিনটি উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি ও বায়ু। কঠিন বর্জ্যের কারণে পরিবেশের এ সবগুলো উপাদান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষ যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে যার বেশির ভাগই কঠিন বর্জ্য। ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে বাতাস দূষিত করে। এ ছাড়া মিথেন কার্বন ডাই-অক্সাইড [illegible] বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুতে মিশে বায়ুদূষণ করে। কঠিন বর্জ্যের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে শহরাঞ্চলের বর্জ্য। শহরের বর্জ্যগুলো বাসাবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাজার, হাসপাতাল, কলকারখানা ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন হয়।

দেশের অধিকাংশ পৌর এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেকেলে। রাস্তার পাশে ডাস্টবিনগুলো ময়লা আবর্জনায় উপচানো থাকে। তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। পরিবেশ নোংরা হয়ে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষ সেখান থেকে ময়লা সরিয়ে শহরের আশপাশের খাল বা খানাখন্দে ফেলে রাখে। সেখান থেকে নতুন করে আরো বিশদ আকারে জীবাণু ও দুর্গন্ধ ছড়ায়। শহরের কলকারখানাগুলো থেকে প্রতিনিয়ত বিষাক্ত বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এগুলোর ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল বলে অনেক প্রতিষ্ঠান এগুলো মুক্তভাবে শহরের খাল-বিল নদী-নালায় ফেলে দেয়। এগুলোর মধ্যে কাপড়ের রং, চামড়া শিল্পে উৎপন্ন বর্জ্য, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, কলকব্জা এসব উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে শহরগুলোতে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ অধিকহারে চলছে। এ কাজের প্রয়োজনীয় উপাদান ইট, বালু, সিমেন্ট ইত্যাদি রাস্তাঘাটে রেখে রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়। এসব থেকে উৎপন্ন বর্জ্যগুলোর ব্যবস্থাপনার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালগুলোতে ব্যবহৃত ওষুধের প্যাকেট, সুঁচ, সিরিঞ্জ, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি বর্জ্য বিপজ্জনক এবং কিছু ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগের বাহকও বটে। তাই এসব বর্জ্য ঢাকনাসহ বাক্সে রেখে আলাদাভাবে ব্যবস্থাপনা করা উচিত। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল বর্জ্যে নতুন কিছু উপাদান সংযোজিত হয়েছে যেমন– মাস্ক, পিপিই, টেস্ট কিট ইত্যাদি।

গ্রামাঞ্চলে কৃষিবর্জ্যও কঠিন বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত। কৃষি জমিতে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক এগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অধিকহারে পেস্টিসাইড ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ব্যবহৃত রাসায়নিকের ক্ষতিকর প্রভাব খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে পড়ছে। কৃষিতে [illegible] বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর থেকেও কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। একটি গরু দৈনিক প্রায় ১২-১৫ কেজি, ছাগল ও ভেড়া ১.৫-২ কেজি, লেয়ার [illegible]গ্রাম, ব্রয়লার ১০০-২০০গ্রাম বর্জ্য উৎপন্ন করে থাকে। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে এ বর্জ্য। এ বর্জ্য থেকে উৎপন্ন দুর্গন্ধ মানুষ ও পশুপাখির বিভিন্নস্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন– [illegible] সমস্যা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি। ক্ষতিকর গ্যাসগুলোর মাত্রাতিরিক্ত সেবন মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিপুল পরিমাণ [illegible] কৃষিজমিতে প্রয়োগ করার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া ভূগর্ভস্থ পানিতে প্রবেশ করছে, যা পানি দূষণ ও জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। পশুসম্পদ বর্জ্য থেকে উৎপাদিত মিথেন বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ শতাংশ দায়ী। একটি গবাদিপশু বছরে প্রায় [illegible]-১২০ কেজি মিথেন নির্গমন করে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে ২৩ গুণ বেশি দায়ী। কঠিন বর্জ্যের মধ্যে বেশকিছু বিপজ্জনক বর্জ্য রয়েছে এর মধ্যে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য প্রধান। এ বর্জ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সায়ানাইড [illegible], অ্যাসবেস্টস, রাসায়নিক, বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক, ভারী ধাতু ইত্যাদি। এ ধরনের বর্জ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য বিষাক্ত, ক্ষয়কারী, বিস্ফোরক হিসেবে অত্যন্ত সক্রিয়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলো থেকে নানা ধরনের ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানি হচ্ছে আমাদের দেশে। প্রতি বছর প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ব্যবহৃত (সেকেন্ড হ্যান্ড) কম্পিউটার তৃতীয় বিশ্বে পাঠানো হচ্ছে। এসব কম্পিউটারের অন্যতম ক্রেতা চীন, ভারত ও বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো। অর্থাৎ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে পরোক্ষভাবে উন্নত দেশগুলোর ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের আস্তাকুঁড়ে পরিণত করা হচ্ছে। এসব ই-বর্জ্যের মধ্যে হাজার হাজার টন সীসাসহ রয়েছে আরও বহু বিষাক্ত উপাদান যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে নিয়ে আসছে এসব দূষিত বর্জ্য পদার্থ বিভিন্নভাবে গ্রিনহাউস প্রভাব বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সরাসরি কৃষি সম্পদ, মৎস্যসম্পদ, বনজ সম্পদ বিনষ্টেরও অন্যতম কারণ।

শুধু ঢাকায় প্রতিদিন ৩২০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। অন্যান্য সূত্র অনুসারে, এই পরিমাণ ৪৫০০-৫০০০ টন পাওয়া গেছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সরকারী উপায়ে মোট বর্জ্যের ৪৩% সংগ্রহ করে। এবং এর কিছু ডাম্পিং স্পট থেকে তুলে পুনর্ব্যবহার করা হয়। মোট বর্জ্যের তেতাল্লিশ শতাংশ হয় বর্জ্য উৎপাদনকারীরা নিজেরা জমা করেন অথবা অবৈধভাবে বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেন। মোট বর্জ্যের তেরো শতাংশ পুনর্ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয়। এই কাজটি মূলত টোকাই, ভাঙারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে করা হয়। অনুমান করা হয় যে বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ, বিচ্ছিন্নতা, পরিবহণ, পুনর্ব্যবহার ইত্যাদির বিভিন্ন পর্যায়ে এক লাখেরও বেশি মানুষ ঢাকা মহানগরীতে জড়িত।

কঠিন বর্জ্যের প্রধান উৎস হলো আবাসিক ঘর (৪৯%), বাণিজ্যিক কেন্দ্র, দোকান, পাট ইত্যাদি (২১%), শিল্প কারখানা (২৩%), এবং হাসপাতাল ক্লিনিক (৭%)। বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের মধ্যে হাসপাতালের বর্জ্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। শিল্প বর্জ্য অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পানি ও মাটি দূষণের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর। শিল্প থেকে নির্গত রাসায়নিকগুলি মাটি দূষিত করে এবং মাটির উর্বরতা ধ্বংস করে, গাছপালা এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত করে। পানির স্তরে দূষিত পদার্থগুলো মিশে গিয়ে পানিকে দূষিত করে, ফলে পানিবাহিত ক্ষতিকর রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বর্তমানে, হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা চলছে পরিবেশের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার কৌশল হিসাবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের ছয়টি প্রধান শহর, যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট থেকে প্রতিদিন মোট ৭,৬৯০ টন পৌর কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয়, যেখানে ঢাকা মোট বর্জ্যপ্রবাহের ৬৯% অবদান রাখে। পুরো বর্জ্যপ্রবাহের প্রায় ৭৪.৪% জৈব পদার্থ, ৯.১% কাগজ, ৩.৫% প্লাস্টিক, ১.৯% টেক্সটাইল এবং কাঠ, ০.৮% চামড়া এবং রাবার, ১.৫% ধাতু, ০.৮% কাচ এবং ৮% অন্যান্য বর্জ্য। বর্জ্য উৎপাদনের কারণগুলো হলো জনসংখ্যার ঘনত্ব, জীবনধারা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ও জলবায়ু পরিবর্তন।

উচ্চ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবারে দৈনিক বর্জ্য উৎপাদনের হার কম আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবারের তুলনায় বেশি। মাথাপিছু উৎপাদনের হার ০.৩২৫ থেকে ০.৪৮৫ কেজি/মাথাপিছু/দিন এবং ছয়টি প্রধান শহরের গড়হার ছিল ০.৩৮৭ কেজি/মাথাপিছু/ দিন। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা এর তথ্য মতে বর্ষাকালে বর্জ্য উৎপাদনের হার বেশি এবং শুষ্ক মৌসুমে কম পাওয়া গেছে, বর্ষাকালে মাথাপিছু বর্জ্য উৎপাদনের হার ৫০০ গ্রাম এবং শুষ্ক মৌসুমে ৩৪০গ্রাম।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অনেক সমস্যা এবং ত্রুটি রয়েছে। প্রধানগুলো হলো- কঠিন বর্জ্যের চূড়ান্ত নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত জমির অভাব, কঠিন বর্জ্য সম্পর্কিত পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, সরকারি খাত, বেসরকারি খাত এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্বের অভাব, সঠিকভাবে পরিচালনার নিয়ম ও মানদণ্ডের অভাব, অর্থের অভাব, এবং অকার্যকর কর সংগ্রহ, বর্জ্য সংগ্রহের অযোগ্য অনুশীলন এবং পুনর্ব্যবহার অনুশীলনকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয়নীতির অনুপস্থিতি।

নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো দ্বারা বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা যেতে পারে এবং বায়ুমণ্ডল কার্বন নিঃসরণ কমাতে জৈব এবং অজৈব বজের্র পুনর্ব্যবহারের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা, ক্লিনিক্যাল বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা, এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা আরোপ করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনঃব্যবহারের বিষয়ে নাগরিক সমাজ এবং পরিবেশ সচেতনতা ক্রিয়াকলাপ প্রচার করা, বর্জ্য পুনরুদ্ধার এবং পুনর্ব্যবহারে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা, সারাদেশে পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচিতে এনজিও এবং মিডিয়ার সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা, সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ এবং সরকারের অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থার মধ্যে কার্যকর ও দক্ষ সমন্বয়ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা, নগরবাসীকে সচেতন করার জন্য গণমাধ্যমের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।

সবশেষে, এটা বলা যেতে পারে যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব, মানসম্মত বাসযোগ্য শহরের অন্যতম দিক। এভাবে, দীর্ঘমেয়াদি এবং ভালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন, আর্থিক ও জাতীয় সুবিধা অর্জন করা যায়। আধুনিক ও যুগোপযোগী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খুব সহজে পরিবেশ সম্মতভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানো সম্ভব। পরিমাণে কম হলেও অপরিশোধিত বর্জ্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তাই পরিবেশ সম্মতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনা সম্ভব। একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। UN HABITAT Day-তে পরিবেশসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী কার্বনরোধী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি সকল সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি কার্বনরোধী বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত করার জন্য।

উপকূলীয় এলাকায় কার্বন দূষণমুক্ত বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীর দুর্যোগ সহনশীল আবাসন

স্থপতি মো. নাফিজুর রহমান[১]
স্থপতি নাহিদ ফেরদৌস দৃষ্টি[২]

ভূমিকা

"Accelerating urban action for a carbon-free world" থিম নিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবার উদ্‌যাপন করা হচ্ছে ২০২১ সালের বিশ্ব বসতি দিবস। এবারের থিমটির উদ্দেশ্য হলো কার্বনমুক্ত পৃথিবী গড়তে বিশ্বব্যাপী সবাইকে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা। বর্তমান বিশ্বে একটি মহা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, যার অন্যতম প্রধান কারণ পরিবেশ দূষণ। নগর অঞ্চলে দ্রুত বর্ধিত জনবসতির সাথে সাথে বেড়ে চলেছে যানবাহন, কলকারখানার, ইট ভাটা ও জীবাশ্ম জ্বালানির কালো ধোঁয়া, যা থেকে প্রতিনিয়ত পরিবেশে নির্গত হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেনসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস। এর ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে বিশ্বের জলবায়ু যার প্রভাব আজ সর্বত্র বিরাজমান। উষ্ণ তাপমাত্রা, ঘন ঘন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে সারা পৃথিবীতে।

বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ইউএন ২০১৪ ওয়ার্ল্ড রিস্ক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পঞ্চমতম[১]। এই দেশে প্রধান যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে ঝড়, বন্যা, নদীর তীর ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্প। এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারসহ সাধারণ জনগণ সবাইকে কাজ করতে হবে সচেষ্ট হয়ে। গড়ে তুলতে হবে দুর্যোগ সহনীয় বিভিন্ন স্থাপনা। সেই সাথে পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের হারকে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রেক্ষাপট

নদীমাতৃক বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশের সাড়ে চার কোটি মানুষের মধ্যে ৭১০ কি. মি. বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ১ কোটি মানুষ চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মাটি, ঘরবাড়ির কাঠামোগত ত্রুটি ও কারিগরি অদক্ষতার কারণে একদিকে যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত, অপরদিকে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও দিনে দিনে অবনতি হচ্ছে। তাই নগরকে উন্নীতকরণের পাশাপাশি কাজ করতে হবে এসব দুর্যোগগ্রস্ত এলাকা নিয়ে।

---

[১]সিনিয়র রিসার্চ আর্কিটেক্ট, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
[২]রিসার্চ আর্কিটেক্ট, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

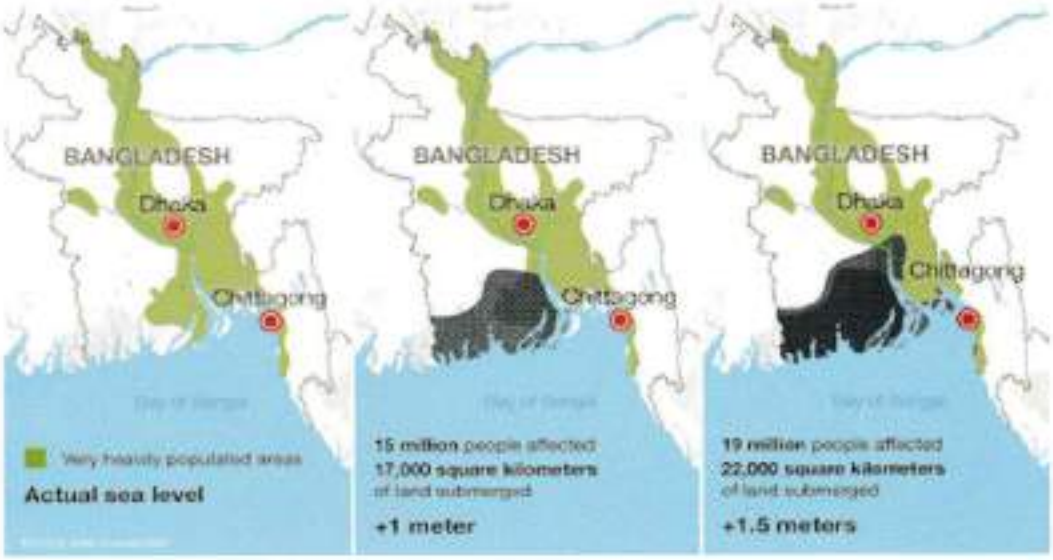

চিত্র ১: বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাস [২]

চিত্র-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তবে প্রায় ১৭,০০০ বর্গ কি. মি. উপকূলীয় এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাবে এবং প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এবং যদি উচ্চতা যদি ১.৫ মিটার বৃদ্ধি পায় তবে প্রায় ২২,০০০ বর্গ কি. মি. উপকূলীয় এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাবে এবং প্রায় ১৯ মিলিয়ন মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রায় ২৫০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে এই সংখ্যা অপ্রতুল হয়ে পড়ছে। এছাড়া, নিজ বাড়ি থেকে সাইক্লোন সেল্টারের অধিক দূরত্ব, ধারণ ক্ষমতার বিপরীতে অধিকতর জনসমাগম, নারী ও পুরুষভেদে আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা না থাকা ও বর্তমানে চলমান COVID-19 প্রেক্ষাপটে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা না হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে উপকূলীয় এলাকার জনগণের দুর্যোগকালে আশ্রয় গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে দুর্যোগকালে তারা তাদের নিজ গৃহে অবস্থান করে দুর্যোগ মোকাবিলা করতে চায় এবং ফলস্বরূপ তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

চিত্র ২: উপকূলীয় এলাকার প্রচলিত বসতির উদাহরণ

প্রস্তাবিত দুর্যোগ সহনীয় প্রকল্প

উপকূলীয় দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ফ্রেন্ডশিপ বাংলাদেশ একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে উপকূলীয় এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার অংশস্বরূপ দক্ষিণাঞ্চলের ৪ (চার)টি উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকিগ্রস্ত গ্রাম (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলা) থেকে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং উক্ত এলাকার ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি, মাটি ও বালির নমুনা যাচাই করে তার প্রেক্ষিতে, এলাকার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঘূর্ণিঝড় সহনশীল বিষয়ক বিভিন্ন কোড অনুসরণ করে একটি মডেল ঘর প্রস্তাব করা হয়েছে (চিত্র: ২)।

চিত্র-২: প্রস্তাবিত মডেল ঘরটির থ্রি-ডাইমেনশনাল চিত্র।

চিত্র-৩: প্রস্তাবিত পরিবেশবান্ধব স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক

১। বৃষ্টির পানি ধারণের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত ছাদ।
২। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ আধার।
৩। বাঁশ দিয়ে নির্মিত স্ক্রিন।
৪। পরিবেশবান্ধব স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক।
৫। ঢালু প্লিন্থ।
৬। সিঁড়ি।
৭। র‍্যাম্প।

ঘরগুলো জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) [৩] অনুসরণ করে নির্মাণ করা হবে, যাতে দুর্যোগকালে এই ঘরগুলোই এক একটি সাইক্লোন সেন্টারের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একটি পরিবারের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হলেও যাতে দুর্যোগকালে আশপাশের ৫-৬টি পরিবারের আশ্রয়স্থল হতে পারে। এতে সাইক্লোন সেন্টারের ওপর চাপ কমানোও সম্ভব হবে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা ও খাবার পানীয় সংকটের কথা বিবেচনা করে প্রস্তাবিত নকশায় ঘরটির ছাদে বৃষ্টির পানি ধারণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বর্তমান কার্বনমুক্ত বিশ্বের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উক্ত মডেল ঘরটিতে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘরটির দেয়াল নির্মাণের জন্য মাটি পোড়া ইটের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে নির্মিত পরিবেশবান্ধব স্যান্ড সিমেন্ট ব্লক, এবং দরজা, জানালা নির্মাণের জন্য স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রী যেমন বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঘরগুলো নির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা এবং এলাকাবাসীদের নির্মাণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা খুব সহজেই তা অনুসরণ করে অনুরূপভাবে নিজেরা ঘর নির্মাণ করতে পারে। সর্বোপরি এরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে একটি হলো "আমার গ্রাম আমার শহর"। এ কার্যক্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরের সুবিধাগুলো গ্রামে পৌঁছে দেয়া। এ লক্ষ্যে এইচবিআরআই শহরের সুউচ্চ দালান কাঠামো বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি গবেষণা করছে দেশের গ্রাম অঞ্চলসহ দুর্যোগগ্রস্ত উপকূলীয় এলাকার আবাসন নিয়ে। এছাড়া সরকারের ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। সুতরাং গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা সম্ভব তেমনি অপরদিকে কার্বনমুক্ত বিশ্বের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট ভূমিকা রাখা সম্ভব। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নির্মাণে পোড়া ইটের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে এটি যেমন গ্রাম পর্যায়ে প্রচার লাভ করবে সেই সাথে ইট-ভাটা ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে শহরে কার্বন নির্গমনের হারকেও প্রশমিত করবে।

তথ্যসূত্র

1. Mucke P (2014) Urbanization-trends and risk assessment. World Risk Rep 2014, 5-10
2. (2009) GRID ARENDAL. https://www.grida.no/resources/5684
3. Bangladesh National Building Code

Energy Efficiency/ Green Gnergy to Reduce Carbon Footprint in Government Building Management System

Ashraful Hoque[1], Kazi Mashfiq Ahmed[2]
Ajanta Shukla Tanma[3], Ashraful Hoque[4]
Kazi Mashfiq Ahmed[5], Ajanta Shukla Tanma[6]

[illegible] ধরে মানব সভ্যতার বিকাশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব বিজ্ঞানীদের উদ্বিগ্ন করছে । [illegible] উন্নয়নের জন্য তাই গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণের বিষয়টি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। গ্রিন বিল্ডিং নির্মাণ করতে না পারলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট [illegible] অবশ্যই থেকে যাবে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সেবা, স্থান বা পণ্য [illegible] কারণে সৃষ্ট নেট গ্রিন হাউস গ্যাস (GHG) নিঃসরণই কার্বন ফুটপ্রিন্ট।(১) এটিকে সমতুল্য কার্বন ডাই-অক্সাইড এককে প্রকাশ [illegible] থাকে। World Resources Institute-এর তথ্য মোতাবেক নিঃসরিত গ্যাসের মধ্যে শুধুমাত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণই [illegible] এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিঃসরণ হয়ে থাকে পরিবহন ব্যবস্থা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন, [illegible], তেল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি প্রভৃতির প্রান্তিক ব্যবহার হিসেবে।(২) Climate Watch-এর তথ্য মোতাবেক সাম্প্রতিক সময়ে [illegible] গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে পার ক্যাপিটা নিঃসরিত গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা ১.৩৭ টন।(৩)

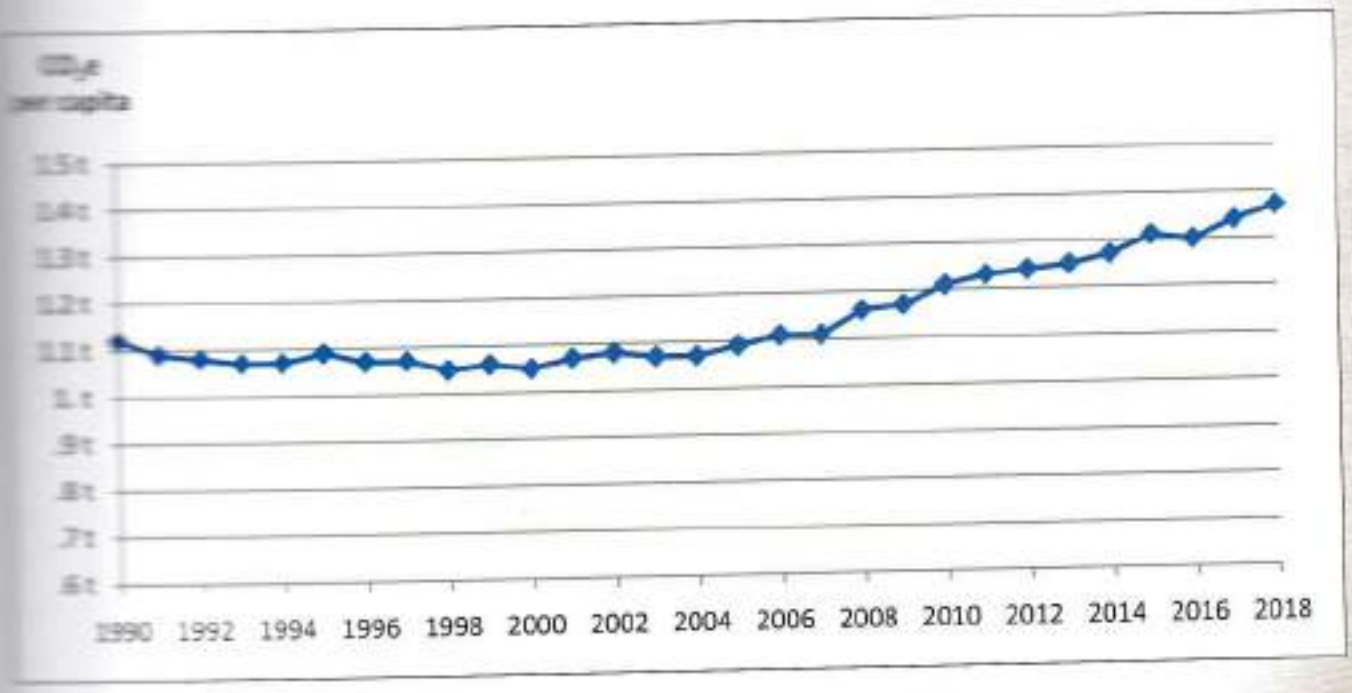

চিত্র ১-বাংলাদেশে বছর ভিত্তিক পার ক্যাপিটা গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণের মাত্রা(১)

[illegible] working at public works department

কার্বন ফুটপ্রিন্টকে মূলত তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়ে থাকে-১। প্রাতিষ্ঠানিক ফুটপ্রিন্ট ২। সাপাই চেইন ফুটপ্রিন্ট ও ৩। প্রোডাক্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট। প্রাতিষ্ঠানিক ফুটপ্রিন্টে মূলত একটি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার কার্যক্রমের মাধ্যমে নিঃসরিত গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা হিসেব করা হয়ে থাকে যেখানে ভবনে ব্যবহৃত এনার্জির পরিমাণ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস ও যানবাহনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোন পণ্য বা সার্ভিসের কাঁচামাল প্রস্তুত ও বিতরণ ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কার্বন নিঃসরণের মাত্রাকে সাপাই চেইন ফুটপ্রিন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর কোনো পণ্য বা সার্ভিসের জীবনকাল বিবেচনায় অর্থাৎ কাঁচামাল প্রস্তুত ও বিতরণ থেকে শুরু করে ব্যবহার, পুনঃব্যবহার, রিসাইক্লিং, ফাইনাল ডিসপোজাল পর্যন্ত কার্বন নিঃসরণের মাত্রাকে প্রোডাক্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

চিত্র ২-কার্বন ফুটপ্রিন্টের প্রকারভেদ (১)

প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনা সম্ভব । এর জন্য যে উপাদানগুলো বিবেচনা করতে হবে তা হচ্ছে আয়ুস্কাল বিবেচনায় রাখা, যথাযথ স্থান নির্বাচন ও ডিজাইন প্রণয়ন, এনার্জি, পানি, ম্যাটেরিয়াল এর সর্বোত্তম ব্যবহার, ভবনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ, সঠিক মানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা , যথামথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। (৪) লক্ষতার সাথে শক্তির ব্যবহার একদিকে যেমন গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমায় একই সাথে শক্তির চাহিদাও কমে যায় সর্বোপরি ব্যয় কমে যায়। এনার্জি এফিসিয়েন্সির সাথে নবায়নযোগ্য শক্তি বা গ্রিন এনার্জির ব্যবহার জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারকে কমিয়ে আনতে পারে ।

গণপূর্ত অধিদপ্তর বাংলাদেশের সরকারি অবকাঠামো নির্মাণের পথিকৃত। আন্তর্জাতিক এনার্জি এজেন্সি (IEA)-এর মতে ভবন নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান ৩০% বৈশ্বিক শক্তি ব্যয় করে এবং ৪০% কার্বন নির্গমন করে।(৫) ফলে গ্রিন বিল্ডিং এর ধারণা আজ আর কোনো বিলাসি কল্পনা নয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে তাল মিলিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরও এর প্রত্যাশী সংস্থা ও চাহিদাভোগীদের টেকসই চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে নির্মাণাধীন/ নির্মিতব্য অবকাঠামোতে সক্রিয় নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কঠোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণাধীন/ নির্মিতব্য সরকারি ভবনসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়ে থাকে-

CFL ও Fluorescent লাইটের পরিবর্তে LED লাইটের ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তির ব্যবহার অনেকাংশেই কমিয়ে আনা । ফ্যানের ক্ষেত্রে সাধারণ AC ফ্যানের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্যান ব্যবহার করা। ভবিষ্যতে BLDC ফ্যান ব্যবহারের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এয়ার কুলারের ক্ষেত্রে ইনভার্টার টাইপ এসির ব্যবহার এবং মানসম্পন্ন অর্থাৎ অধিক মাত্রার Coefficient of Performance (COP) বিশিষ্ট এয়ার কুলার ব্যবহার করা। দিবালোকের উত্তম ব্যবহার তথা Day Light Harvesting System এবং প্রাকৃতিক ক্রস ভেন্টিলেশন নিশ্চিত করা । Energy efficient glazed windows ব্যবহার করা। এছাড়া গ্রিন এনার্জি তথা নবায়নযোগ্য শক্তির মধ্যে রয়েছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, হাইড্রো পাওয়ার, বায়োমাস প্রভৃতি। এসবের মাঝে খুব সহজেই সোলার , বায়োমাস প্রভৃতি সরকারি ভবনসমূহে ব্যবহার হয়ে আসছে এবং এর ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। Building Management System (BMS)-এর কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা।

[illegible] নিশ্চিত করা। পানির ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে সরকারি ভবনসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থা করা।

[illegible] কার্বন নিঃসরণ মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য তিনটি ফ্যাক্টর বিবেচনা করা যেতে পারে-১। স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার [illegible] ম্যানেজমেন্ট ও ৩। কৌশলগত বিশ্লেষণ। (৬) সরকারি ভবনসমূহ নির্মাণ ও পরবর্তীতে পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত [illegible] বিবেচনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে সাপাই চেইন ফুটপ্রিন্টের কার্বন নিঃসরণ মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব।

[illegible] পণ্য বা সার্ভিসের গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ বিবেচনা করে যোগানদাতা, ম্যাটেরিয়ালস, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বিতরণ প্রক্রিয়া এবং [illegible] পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে ইটের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব বক, নিম্ন Global [illegible] (GWP) বিশিষ্ট এয়ারকুলার রেফ্রিজারেন্টের ব্যবহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রিসাইকেল্ড প্লাস্টিক বা স্টিল, কাঠ [illegible] মাধ্যমেও প্রোডাক্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো যেতে পারে। সরকারি ভবনসমূহ নির্মাণ ও পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণের সময় [illegible] কার্বন ফুটপ্রিন্ট বিশিষ্ট পণ্য বা সার্ভিস ব্যব্যহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যোগানদাতাদেরও এ [illegible] আসতে হবে এবং তাদের স্বল্প প্রোডাক্ট কার্বন ফুটপ্রিন্ট বিশিষ্ট পণ্য বা সার্ভিসের বিষয়ে প্রচারণা করতে হবে এবং সকল স্তর [illegible] এসব পণ্য বা সার্ভিস ব্যবহারের বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

[illegible] সরকারি ভবনসমূহে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য BNBC কঠোরভাবে অনুসরণ এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য [illegible] নীতিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত অডিট বা মূল্যায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর ধারা [illegible] হবে।

[illegible]

[illegible] January 2018. CTV043 v3 https://prod-drupal-files.storage.googleapis.com/documents/resource/restricted/carbon-footprinting-guide.pdf

[illegible] https://www.climatewatchdata.org/

[illegible] https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?calculation=PER_CAPITA&end_year=2018&gases=all-ghg&regions=BGD&sectors=total-including-lucf&start_year=1990

[illegible] ESCAP https://www.unescap.org/sites/default/files/3.%20Green-Buildings.pdf

[illegible] https://www.iea.org/topics/buildings

[illegible] https://www.[illegible].com/managed-packaging/knowledge-center/articles/supply-chain-carbon-footprint

শহর এলাকায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে করণীয়

শাহীন আহম্মেদ[১]

সূচনা

অধিক পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ-এর কারণে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং এর বিশেষ প্রভাব পড়ছে উন্নয়নশীল দেশের বড় শহরগুলোর আবহাওয়া ও পরিবেশে। শহরগুলোতে তার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর তুলনায় অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলো এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও সবচেয়ে কম কার্বন নিঃসরণ করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৯তম। বছরে মাথাপিছু ০.৫৩ টন কার্বন ব্যবহার করে এ দেশের মানুষ। এসডিজিতে বেঁধে দেয়া মাত্রার চেয়েও যা আশি ভাগ কম। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ এবং এর অর্থনীতি দ্রুত বর্ধনশীল। ফলে এ দেশের শহর অঞ্চলগুলোতে জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নতি ঘটছে। শহর অঞ্চলের মানুষ উন্নত জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে অধিক হারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকতে চাচ্ছে। ফলে বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে মার্কেট, অফিস-আদালত এমনকি সেলুনেও এখন হরদম এসি চলছে। রাস্তাঘাটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সংখ্যাও প্রতিদিনই বাড়ছে। শহরে অধিক পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ এর মূল উৎস হচ্ছে বিভিন্ন যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানির অধিক ব্যবহার এবং সিএফসি গ্যাস নির্গমনকারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিশেষ করে এসি'র ব্যবহার। ফলে আধুনিক জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়তই কার্বন নিঃসরণ বাড়াচ্ছি এবং নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করছি। তাই বর্তমানে একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে শহর এলাকায় কার্বন নিঃসরণ কমানো।

কার্বন নিঃসরণ কমানো বেগবান করার কিছু সুপারিশমালা

১. বাসাবাড়ি/এপার্টমেন্ট-এর ছাদে সোলার সিস্টেম বসানো

বাংলাদেশের একটি প্রধান সুবিধা হলো সব মৌসুমেই সূর্যের আলো পাওয়া যায়। ফলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সারাদেশে সোলার হোম সিস্টেমকে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। সরকারি সংস্থা স্রেডা ও বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ শক্তি এক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইন্টারনেট সূত্রমতে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম বসানো হয়েছে এবং প্রায় ১৩ মিলিয়ন সুবিধাভোগী সৌরবিদ্যুৎ পাচ্ছে। যত বেশি নবায়নযোগ্য উৎস (রিনিউয়েবল সোর্স) হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে ততই কার্বন সমৃদ্ধ জীবাশ্ম জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর চাপ কমবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে। ফলে প্রতিটি বাসাবাড়ি/এপার্টমেন্ট এর ছাদে সোলার সিস্টেম বসানোর ব্যবস্থা নিতে হবে প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাথি হিসেবে।

---

[১]সিনিয়র প্লানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, জেলখানা, সিলেট

[illegible] রাস্তা এবং অলি-গলিতে সৌরশক্তি চালিত লাইটের ব্যবস্থা করা

সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার রাস্তায় এবং অলি-গলিতে সৌরশক্তিচালিত লাইটের ব্যবস্থা এখন শুধু যুগের দাবি নয় বরং অপরিহার্য [illegible]। কিছু এলাকায়/হটস্পটে পরীক্ষামূলকভাবে জিপিএস এবং জিআইএস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারসহ সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন [illegible] সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সমগ্র এলাকায় এর বিস্তার ঘটাতে হবে। সোলার প্যানেলগুলো পরিষ্কার ও ব্যাটারি [illegible] ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে।

[illegible] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কারখানার খোলা ছাদে গ্রিড টাই সোলার সিস্টেম স্থাপন

[illegible] বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কারখানা যেখানে খোলা ছাদ আছে সেখানে সোলার সিস্টেম বসানো ইতোমধ্যে [illegible]। তবে এর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে হবে। এ ব্যবস্থা কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি ঐ সব প্রতিষ্ঠান ও কারখানার বিদ্যুৎ বিল [illegible] উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সোলার প্যানেল ব্যবহারকারী সংস্থাগুলোর জন্য সরকারি প্রণোদনা বা ট্যাক্স রিবেটের ব্যবস্থা [illegible] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কারখানার মালিকরা সোলার সিস্টেম স্থাপনে উৎসাহিত হয়।

[illegible] গণপরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত কমিশনিং

[illegible] মেট্রোরেল এবং পাতাল রেল তৈরি হচ্ছে তার মাধ্যমে অনেক লোক একটি পরিবহণে/গণপরিবহণে যাতায়াত করতে পারবে। [illegible] গাড়ি চলাচল কমবে, যানজট কমবে এবং নিঃসন্দেহে কার্বন নিঃসরণ কম হবে। ফলে শহরের হিট আইল্যান্ডগুলোর [illegible] আশা করা যায়। এ সমস্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থার দ্রুত কমিশনিং করা দরকার।

[illegible] এলপিজিতে রূপান্তরের সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবনে গবেষণা

[illegible], বায়োগ্যাস প্লান্ট ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থানে রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৭৬,৭৭১টি বায়োগ্যাস প্লান্ট [illegible]। এসব বায়োগ্যাস প্লান্টের গ্যাসকে এলপিজিতে রূপান্তরের সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবনে গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। ফলে আমদানি [illegible] এলপিজি গ্যাসের ওপর চাপ কমবে এবং সাধারণ মানুষ রান্নার কাজে কাঠ-খড়ি পোড়ানোর মতো কার্বন নিঃসরণকারী রান্নার চুলা হতে [illegible] এবং এলপিজি চুলায় রান্নায় অভ্যস্ত হবে। মহিলাদের শ্বাসযন্ত্র সম্পর্কীয় রোগ হ্রাস পাবে এবং পরিবেশ দূষণ কমবে।

[illegible] প্রকল্পে মিনি গ্রিড ব্যবস্থার প্রবর্তন

[illegible] আবাসন প্রকল্পে মিনি গ্রিড এর মাধ্যমে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুযোগ রাখতে হবে এবং মিনি গ্রিড স্থাপন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

[illegible] ক্লিন স্টোভের ব্যবহার বৃদ্ধি

[illegible], পরিবেশবান্ধব চুলা (ক্লিন কুকিং স্টোভ) ব্যবহারে বাংলাদেশে বিশ্বে ৫ম স্থানে রয়েছে। ২০১৪ সালে এমন পাঁচ লাখ চুলা স্থাপন করা হয়। এমন চুলা আমদানিতে সরকারি সহায়তার কারণে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাও কার্বন নিঃসরণ কমাতে [illegible] ভূমিকা রাখছে। পৌরসভা এলাকা যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ নেই সে সমস্ত এলাকার লোকজনকে ক্লিন স্টোভের ব্যবহার [illegible] করতে হবে।

[illegible] সৌর বিদ্যুৎচালিত যানবাহন উদ্ভাবন এবং ব্যবহার বৃদ্ধি করা

[illegible] সূত্রে সৌরশক্তিচালিত রিকশা, ইজি-বাইক, স্কুটি, তিন চাকার অ্যাম্বুলেন্স/ভ্যান ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে

রিকশাওয়ালাদের মানুষ টানার মতো অমানবিক কাজ এক সময় বিলুপ্ত হতে পারে। এটা বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদার জন্যও একান্ত দরকার।

৯. সৌরবান্ধব বিল্ডিং ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

বাংলাদেশে বিল্ডিং ডিজাইনের ক্ষেত্রে সৌরশক্তিবান্ধব বিল্ডিং ডিজাইন করা গেলে আলো, বাতাস, গরম হতে প্রশান্তির জন্য বিদ্যুতচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভবপর হবে। স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সৌরবান্ধব করার জন্য স্থপতিদের মধ্যে সৌরবান্ধব বিল্ডিং ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ ডিজাইনটি মডেল হিসেবে গ্রহণ করে সরকারি বেসরকারি নির্মাণ সংস্থা তাদের ইমারত নির্মাণ করলে বিদ্যুৎ এর সাশ্রয় হবে এবং এসব ইমারত হতে কার্বন নিঃসরণ কম হবে।

১০. ছাদ-কৃষির প্রসার ঘটানো

আমরা সবাই জানি যে, গাছ বায়ু হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। তাই শহর অঞ্চলে যত বেশি ছাদ কৃষি বা বাগান হবে তত বেশি কার্বন বায়ু হতে কমবে। তাছাড়া এমবিয়েন্ট তাপমাত্রাও কমে আসবে।

উপসংহার

বিশ্ব বসতি দিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য "Accelerating Urban Action for a Carbon-free World" বিষয়টি নিয়ে প্রতিটি সচেতন নাগরিকের ভাবা উচিত। শুধু আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনার সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশের জন্য নগরের পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্টকারী কার্বন নিঃসরণে পরোক্ষ ভূমিকায় অংশগ্রহণ না করে-এর Mitigation Measures-গুলো যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে তাতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা সকলের উচিত।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.dw.com/bn/কার্বন-নিঃসরণ-কমাতে-বাংলাদেশের-উদ্যোগ/a-41331218, retrieved on 01-09-2021
২. https://bonikbarta.net/home/news_description/২২০১৭৪/কার্বন-নিঃসরণে-এগিয়ে-যেসব-দেশ, retrieved on 01-09-2021
৩. http://www.sreda.gov.bd/ site/page/5d298273-8901-4865-aca4-0fcdb6e251e/-retrieved on 01-09-2021

ফটো গ্যালারি ০৪

গণপূর্ত অধিদপ্তরের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি

গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক রমনা পার্ক, ঢাকার সংস্কার কাজ পরিদর্শন করছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি এবং সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ, এমপি মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন' তৈরি উপলক্ষে ফরেন সার্ভিস
প্রশিক্ষণ একাডেমিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

রাজধানীর তেজগাঁও এ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত দুটি ৮ তলা ভবন (৫৮টি ফ্ল্যাট), বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মাদারীপুর জেলায় নির্মিত ১০ তলা সমন্বিত অফিস ভবন, বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

মালিবাগ আবুজর গিফারী কলেজ সংলগ্ন জমিতে সরকারি চাকরিজীবীদের আবাসনের জন্য ৪টি ভবন (নতুন ৪৫৬টি ফ্ল্যাট) তৈরি প্রকল্প, বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

রাজধানীর মতিঝিল সরকারি কলোনিতে সরকারি কর্মচারীদের আবাসনের জন্য ৫টি ২০ তলা ভবন (৩৮০টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

রাজধানীর মিরপুরে প্রায় আড়াই হাজার বস্তিবাসীর বসবাস উপযোগী স্বল্প ভাড়ার ৫টি ১০ তলা ভবন (৫৩৩টি ফ্ল্যাট) নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত মুরাদনগর ২নং গেইট ও জিইসি জংশন ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

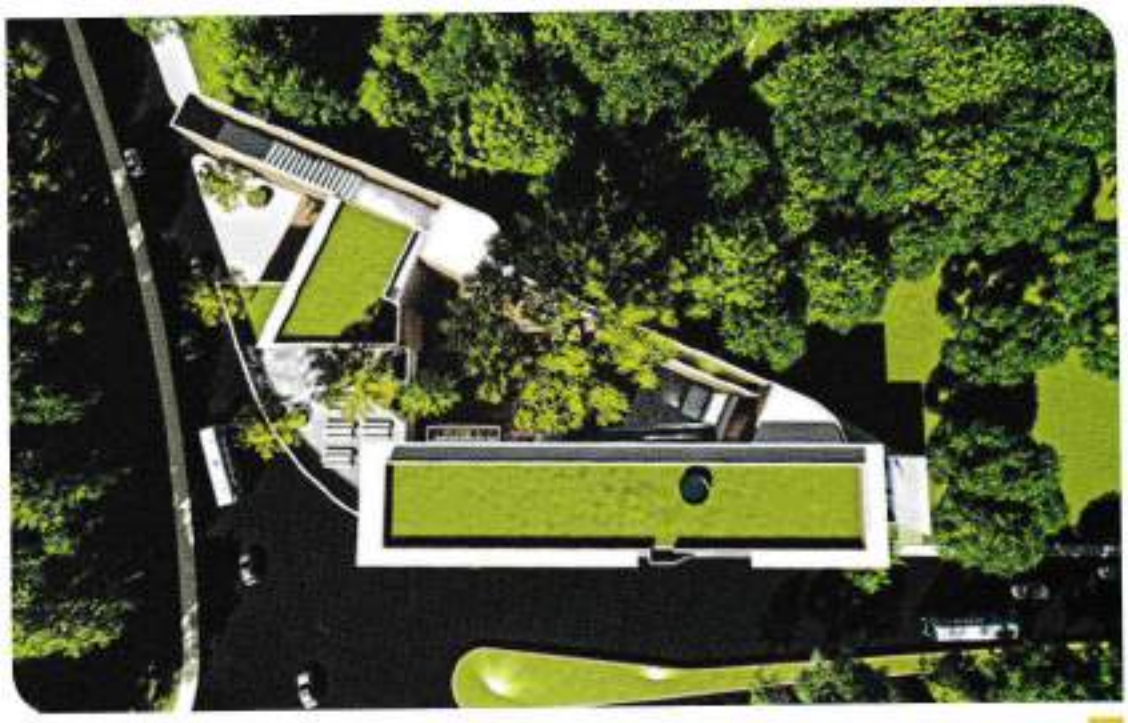

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মাণাধীন মুজিব স্কয়ার প্রকল্প মডেল

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মুজিব স্কয়ারের 3-D চিত্র

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিতব্য ১৬.৫০ কি. মি. এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসিক ফ্ল্যাট উন্নয়ন প্রকল্প ১-এর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি

বৃষ্টির পানি সংগ্রহে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও কার্বনমুক্ত আগামীর বিশ্ব

মো. নজিবর রহমান[১]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি প্রাচীন পদ্ধতি। যে সমস্ত স্থানের ব্যবহারযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠের পানি (Surface water) বা ভূ-গর্ভস্থ পানি (Under ground water) অপর্যাপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য সে সব অঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প বিশুদ্ধ পানির উৎস হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যেখানে সুপেয় পানির অভাব (লবণাক্ত) রয়েছে সেই সব স্থানে বড় বড় মটকা ও নির্ধারিত পুকুরে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে তা ব্যবহার করে আসছে। তবে দেশের মহানগর, নগর ও অন্যান্য এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিই প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার তেমনভাবে বৃদ্ধি পায়নি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলন ঘটিয়েছে।

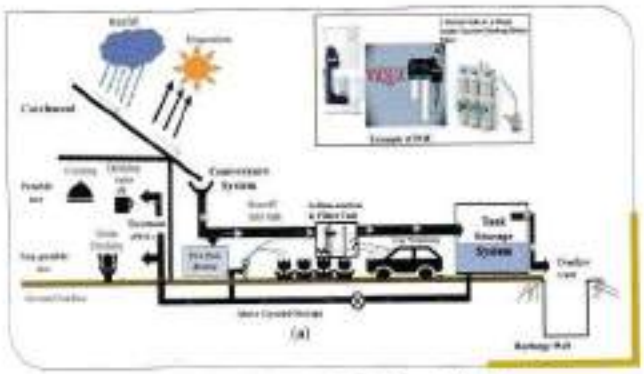

Roof Top Rainwater Harvesting (Rain Barrel /Cistern)

কৃষিকাজে, গৃহস্থালীকাজে, শিল্পকলকারখানায় ব্যাপকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন অস্বাভাবিকভাবে নেমে যাচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে প্রতি বছর ২ মিটার থেকে ৩ মিটার পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে এবং জীব-জন্তু তথা প্রাণীদের উপর একটি বিরূপ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে এবং অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হতে চলেছে।

Underground recharge by Dry/ Bore well

অধিক ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকা শহরে ঢাকা ওয়াসা ও অন্যান্য সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন ২৫০ কোটি লিটারের অধিক ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে থাকে। আর এতে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি শক্তি (Energy) ব্যবহার করতে হয়।

শুধু ঢাকা শহর নয় দেশের অন্যান্য মহানগর ও নগর এমন কি গ্রামীন জনপদের অবস্থাও একই রকম। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে যেমন ব্যাপক জ্বালানি শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে একইভাবে পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার কারণে এখন আর পুকুরে পর্যাপ্ত পানি থাকে না। অথচ এ সকল পুকুর আগেকার দিনে গোসলসহ নান ধরনের দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজে ও কৃষিতে সেচের জন্য ব্যবহার হতো।

[১]প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

[illegible]

[illegible] Zero carbon compendium: who's doing what in housing worldwide. Amersham: NHBC Foundation; 2009.

[illegible] 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast). Official Journal of the European Union; 2010. ([illegible] eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF).

[illegible] Architects of a low-energy future. Nature 2008;452(3):520–3.

[illegible] Net zero energy buildings – worldwide. (http://batchgeo.com/map/ net-zero-energy- buildings); 2013 [accessed 27.09.13].

[illegible] Torcellini P. Getting to net zero. ASHRAE J 2009;51 (9):18–25.

[illegible] Climate Change 2007. Fourth IPCC Assessment Report, Intergovernmental Panel on Climate Change; 2007.

[illegible] Budget 2008 stability and opportunity: building a strong, sustainable future. London: The Stationery Office; 2008.

[illegible] Building a greener future: towards zero carbon development: consultation. London: Department for Communities and Local Government (DCLG); 2006.

[illegible] From net energy to zero energy buildings: defining life cycle zero energy buildings (LC-ZEB). Energy Build 2010;42:815–21.

[illegible] Deru M, Crawley D. Zero energy buildings: a critical look at the definition. In: Proceedings of the ACEEE summer study. California, USA; Aug 14–18, 2006.

[illegible] Rezgui Y. An investigation into recent proposals for a revised definition of zero carbon homes in the UK. Energy Policy 2012;46:25–35.

[illegible] Voss K. Net zero energy buildings: a consistent definition framework. Energy Build 2012;48:220–32.

[illegible] Bourrelle JS, Musall E, Voss K, Sartori I, et al. Zero energy building – a review of definitions and calculation methodologies. Energy Build 2011;43(4):971–9.

[illegible] Differentiating among low-energy, low-carbon and net-zero-energy building strategies for policy formulation. Build Res Inf 2012;40 (5):625–37.

[illegible] Carbon reduction in existing buildings: a transdisciplinary approach. Build Res Inf 2010;38(1):1–11.

[illegible] Low energy buildings in Europe: current state of play, definitions and best practice. Brussels: European Commission; 2009. [22] Erhorn H, Erhorn-Kluttig H. Terms [illegible] for high performance buildings, concerted action report. European Union; 2011.

[illegible] Zero carbon buildings: contexts, challenges and strategies. Build J 2013;January:71–3.

[illegible] Building regulations in energy efficiency: compliance in England and Wales. Energy Policy 2012;45(6):594–605.

[illegible] Augusto A, Lerer MM. Solar powered net zero energy houses for southern Europe: feasibility study. Sol Energy 2012;86:634–46.

[illegible] Lowe R. Challenges and future directions for energy and buildings research. Build Res Inf 2012;40(4):391–400.

[illegible] Fuller RJ. Progress in ZEBs—a review of definitions, policies and construction activity. Energy Policy 2013;62:196–206.

কার্বন শূন্য নগরায়ণের সন্ধানে

মোহাম্মদ নূর হোসেন খাঁন[১]

একমাত্র কার্বন নেতিবাচক দেশ : ভুটান

চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী প্রায় ১৪ হাজার ৮০০ বর্গমাইল নিয়ে অপরূপ হিমালয়ের পূর্বাংশে চির সবুজের দেশ ভুটান। সমতল ভূমি থেকে বেশ উঁচুতে এই ভুটান, প্রাচ্যের নিউজিল্যান্ড হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এত নৈসর্গিক, এত শান্তিপ্রিয় মানুষের কথা ভেবে পৃথিবীর অধিকাংশ পর্যটক ঘুরতে আসেন ভুটানে। কিন্তু আমরা কি জানি, পৃথিবীর মধ্যে একটি দেশ রয়েছে, যেটি কার্বন নিরপেক্ষ নয়, বরং পরিপূর্ণ কার্বন নেতিবাচকও? এটি হলো ভুটান। বেশির ভাগ দেশ যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করতে সক্ষম তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি গ্যাস নির্গমন করলেও এখন পর্যন্ত বহু সম্মেলন করেও নিরপেক্ষের কাছাকাছি পর্যন্ত আসতে পারে নি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথম ব্যতিক্রম দেশ ভুটান। দেশটির মোট ভূমির ৭০ শতাংশ বনাঞ্চল। প্রাকৃতিক অক্সিজেন সিলিন্ডারসমেত উঁচু উঁচু পর্বতমালা সারিবদ্ধভাবে নৈসর্গিক সৌন্দর্য বহন করে দেশটি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এদেশের মানুষের প্রধান কাজ বনায়ন বা কৃষিকাজ। বন রক্ষার পাশাপাশি ভুটানবাসী কয়েক বছর আগে ঘণ্টায় ১৫ হাজার গাছ রোপণ করে বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছে।

প্রায় ৮ লাখ মানুষ নিয়ে এই দেশটি। টেলিভিশন চালু হয় ১৯৯৯ সালে। এখানে অধিক মাত্রায় জ্বালানি বা শক্তির প্রয়োগ না থাকায় যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন হয় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি কার্বন শোষণক্ষম হওয়াতেই এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত।

গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুতগতিতে বাড়ছে এবং এর বায়ুমণ্ডলে অকল্পনীয় পরিবর্তন হচ্ছে বেশামালভাবে।

মানুষের কারণে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড অন্যতম। ভুটান বার্ষিক ১৫ লাখ টন কার্বন নির্গমন করে। যেখানে দেশটির কার্বন শোষণ ক্ষমতা ৬০ লাখ টন। বৌদ্ধমূর্তি পর্বত চূড়ায় উঠলেই পুরো থিম্পু শহরটি দু'চোখের সীমায় আটকে রাখা যায়। একটি দারুণ ব্যাপার হলো, এ শহরে কোনো ট্র্যাফিক বাতি নেই। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যখন বিভিন্ন সচেতনতামূলক সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত, ভুটান সেখানে কার্বন নেতিবাচক দেশ হিসেবে ইতোমধ্যে স্থান করে নিয়েছে। মূলত, দেশটির বেশকিছু নীতি তাদের আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

সৌরশক্তি ব্যবহারে শীর্ষস্থানে বাংলাদেশ

বিশ্বে সৌরশক্তি ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বিশ্বে ৬০ লাখ সৌরপ্যানেলের মধ্যে ৪০ লাখই

[১] প্রোগ্রামার, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয়।'রিনিউয়েবলস ২০১৭ গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট-এ এসেছে এই তথ্য। রিনিউয়েবলস ২০১৭ গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লাখ সৌরশক্তির প্যানেল রয়েছে। এছাড়া ক্লিন স্টোভ ও বায়োগ্যাস ব্যবহারেও সামনের দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। এতে প্রচুর কর্মসংস্থানও তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে ৫ম স্থানে রয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে বিশ্বে ৬০ লাখেরও বেশি স্থানে সৌরশক্তি ব্যবহার চলছে, আর এতে উপকৃত হচ্ছে আড়াই কোটি মানুষ। বিশ্বের অর্ধেকের বেশি সৌরশক্তির প্যানেলে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। এর সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ বাংলাদেশের প্রধান সুবিধা হলো সব মৌসুমেই সূর্যের আলো পাওয়া যায় : "বাংলাদেশের প্রধান সুবিধা হলো সব মৌসুমেই সূর্যের আলো পাওয়া যায়। ফলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ। শুরুতে হোম প্যানেলের দাম অনেক বেশি থাকলেও এখন ৭-৮ হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। এখন ১০ ধরনের সোলার এনার্জি সিস্টেম আছে। যে যার চাহিদা অনুযায়ী বসাতে পারেন।" "বাড়ির ছাদে সৌরশক্তি প্যানেলগুলো সূর্যের আলো থেকে শক্তি নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুবিধা হলো এই যে, এরা ছোট বা বা বড় দু'রকমই হতে পারে। বাড়ির ছাদে ৫ কিলোওয়াট বা ১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বসানো যায় এর মাধ্যমে সৌরকোষের সাহায্যে সৌরআলোককে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা হয়।" অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব চুলা (ক্লিন কুকিং স্টোভ) ব্যবহারে বাংলাদেশে বিশ্বে ৫ম স্থানে রয়েছে। ২০১৪ সালে এমন পাঁচ লাখ চুলা স্থাপন করা হয় এমন চুলা আমদানিতে সরকারি সহায়তার কারণে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে রিপোর্টে বলা হয়। ২০১৫ সালে ২ কোটি পরিবেশ বান্ধবচুলা সরবরাহ করা হয়। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে চীন। এরপর ভারত, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া ও বাংলাদেশ। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহারেও বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থানে রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৪৫ হাজার ৬১০টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রয়েছে। ২০১৬ সালে বায়োগ্যাসের মাধ্যমে রান্নার বিষয়টি বেড়ে গেছে। এশিয়াতেই এই হার অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি চীনে (৪ কোটি ২৬ লাখ)। এরপর ভারতে (৪৭ লাখ) । এশিয়ায় আরও ৬ লাখ ২০ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রয়েছে। ২০১৬ সালে অনেক প্রতিষ্ঠান গাড়িতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে কাজ শুরু করেছে। চলতি বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌরশক্তিচালিত তিন চাকার অ্যাম্বুলেন্স দেখা যেতে পারে। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে সারাবিশ্বেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ১.১ শতাংশ বেড়েছে। আর এতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯৮ লাখ মানুষের। তথ্য-প্রযুক্তি খাতে সোলার ফটোভোলটাইক ও জৈব জ্বালানি সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে। সারাবিশ্বেই বিশেষ করে এই এশিয়াতে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে এই সংখ্যা বেড়েছে ১০ শতাংশ। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল রিনিউবেল এনার্জি এজেন্সির (আইআরইএনএ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের চেয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুতে খরচ কম। সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ গড়ে ৬ দশমিক ৮ সেন্ট। (প্রতি সেন্ট ৮৫ পয়সা ধরলে বাংলাদেশি টাকায় ৫ টাকা ৭৮ পয়সা হয়)। প্রতিবছরে এ উৎপাদন ব্যয় গড়ে ১৩ শতাংশ হারে কমছে। স্থল ও সাগর ভাগে স্থাপিত বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয়ও প্রতিবছর কমছে। স্থলভাগে স্থাপিত বায়ুবিদ্যুতের ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৩ সেন্ট (৪ টাকা ৫০ পয়সা) ও সাগর ভাগে স্থাপিত কেন্দ্রের ব্যয় ইউনিট-প্রতি ১১ দশমিক ৫ সেন্ট (৯ টাকা ৭৭ পয়সা)। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২১ সালে যেসব সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসবে, তার ব্যয় আরও কমে যাবে। সারা দুনিয়ায় আগামী বছর স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ব্যয় হবে ৩ দশমিক ৯ সেন্ট (৩ টাকা ৩১ পয়সা), যা ২০১৯ সালের ব্যয় থেকে ৪৩ ভাগ কম।

জাহাজ ভাঙা শিল্প পরিবেশের উপর প্রভাব

জাহাজ ভাঙা একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। উন্নত দেশগুলোতে এখন আর এই কাজটি এখন আর করা হয় না। কারণ নানা রকম বিষাক্ত উপাদান থাকে পুরানো এসব জাহাজে। যেমন Asbestos Ges Polychlorinated Biphenyls Asbestos দিয়ে লোহার উপর আস্তর দেয়া হয়। মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক হওয়ায়, ৮০ দশকের মাঝামাঝিতে জাহাজ নির্মাণে Asbestos-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। উন্নত দেশে জাহাজ থেকে এই পদার্থ অপসারণ করতে হলে অনেক ঝামেলা। জাহাজ ভাঙার কিংবা কাটার সময় এক ধরনের বিষাক্ত নির্গত হয়। তার উপর রয়েছে asbestos মিশ্রিত ধুলা যা অতি সহজে মানবদেহের ফুসফুসে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। পুরাতন জাহাজ থেকে মারাত্মক বিষাক্ত পারমাণবিক বর্জ্য, বিষাক্ত রাসায়নিক, টক্সিন, প্রাণঘাতি যৌগ ডাম্প করা হয় সমুদ্রে যা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার সমুদ্র বাস্তুসংস্থানের চরম পর্যায়ের ক্ষতি সাধন করছে।

কার্বনমুক্ত হোটেল তৈরি করল শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব কম নয়। সে দেশের একটি হোটেল চেন পুরোপুরি কার্বন-নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করছে : দারচিনি গাছের কাঠ থেকে শুরু করে সোলার প্যানেল পর্যন্ত সে এক অভিনব প্রচেষ্টা। জেটউইং কোম্পানির ৩০টি হোটেল আছে, অভিজাত হোটেল, সারাবিশ্ব থেকে অতিথিরা আসেন। জেটউইং-এর চেয়ারম্যান হিরণ কুরে বলেন, "মানুষ আর আমাদের পৃথিবীর কথা মনে না রাখলে, কোনো ব্যবসাই দীর্ঘকাল চলতে পারে না।" পন্থা হলো আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, যার রসদ হবে প্রাকৃতিক কাঁচামাল, যেমন দারচিনি গাছের বাকল ছাড়িয়ে নেওয়ার পর যে ডালগুলো বাকি থাকে। অপরদিকে একটি হোটেল সংস্থার পক্ষে নিজেদের জ্বালানি শক্তি সরবরাহের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া একটা ঝুঁকি বৈকি। কুরে-র ভাষায় : "আমরা একটা রোল মডেল হতে পারি– কিংবা গিনিপিগ!" কিন্তু জেটউইং আসলে কতটা পরিবেশবান্ধব? "আয়ুবোয়ান, স্বাগতম, দীর্ঘজীবী হোন। ভেতরে আসুন"- স্বাগত জানালেন কুরে তাঁর বাসভবনে। জেটউইং-এর প্রধান শ্রীলঙ্কার পর্যটন শিল্পের চাঁই হিসেবে গণ্য। তাঁর বাবা হারবার্ট সত্তরের দশকে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখনই পরিবেশের কথা ভাবা হয়েছিল। কুরে শোনালেন: "আমার বাবা চিরকাল বিশ্বাস করতেন যে, আমরা যেখানেই হোটেল তৈরি করি না কেন, আমরা সেখানে অপরিচিত। কাজেই পরিবেশের দিকে নজর রাখা আর স্থানীয় বাসিন্দারা যাতে হোটেল থেকে উপকৃত হন, তার খেয়াল রাখা তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।" কোম্পানিটি পারিবারিক: কুরে-এর তিন পুত্রের মধ্যে দু'জন নিজেদের কোম্পানিতে কাজ করেন। ব্যক্তিগত পর্যায়েও পরিবেশবান্ধব চিন্তাধারা : বাড়ির প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ আসে সোলার প্যানেল থেকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে পরিবেশবান্ধব উপকরণ, বেসিন পরিষ্কার রাখে কফির গুঁড়ো। প্রায়ই দেখা যায় রান্নাঘর বা বাথরুমের বেসিনে পানি জমে যায়। এই অবস্থা যাতে না হয়, তার জন্য আগে থেকেই মাঝে মাঝে বেসিনে কফির গুঁড়া ঢেলে দিন আর সঙ্গে দিন যথেষ্ট পানি। কফির গুঁড়ো নিয়মিত বেসিনে দিলে বেসিনের পাইপ পরিষ্কার থাকবে। তবে পানি একবার জমে যাওয়ার পর কফির গুঁড়ো দিলে কিন্তু ফল হবে বিপরীত। নেগোম্বো শ্রীলঙ্কার পশ্চিম উপকূলের একটি সুদৃশ্য বন্দরনগরী। এখানে কাছাকাছি মোট পাঁচটি জেটউইং হোটেল আছে। যে গ্রিড থেকে এই সব হোটেলের বিদ্যুৎ আসে, তা দেখলে মান্ধাতার আমলের মনে হতে পারে; কিন্তু শ্রীলঙ্কার বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রায় ৩০ শতাংশ আসে নবায়নযোগ্য উৎস, যেমন জলবিদ্যুৎ থেকে। কাজেই কার্বন-নিরপেক্ষ হবার জন্য জেটউইং-কে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে না। হোটেলগুলোর অর্ধেক বিদ্যুৎ খরচ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের দরুন। এয়ারকন্ডিশনিং সাধারণত চলে বিদ্যুতে ও বাতাস ঠাণ্ডা করার রেফ্রিজারেন্টে। জেটউইং-এর পাঁচটি হোটেলে এক নতুন ধরনের এয়ারকন্ডিশনিং ব্যবহার করা হচ্ছে, যা বাষ্প থেকে শৈত্য সৃষ্টি করতে পারে– অর্থাৎ এক পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। মেকানিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে জার্মান জিআইজেড আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা। পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব একটি হোটেল চেন শুধু শ্রীলঙ্কাতেই নয়, অন্যত্রও দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়।

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীসমূহ

মোঃ আশরাফুল আলম[১]
ড. সৈয়দা সায়কা বিনতে আলম[২]

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একমাত্র অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ তৈরি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বহুল ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাটি পোড়ানো ইট। দেশে প্রতি বছর ২৫০০ কোটিরও বেশি ইট উৎপাদন হয়। এই বিশাল পরিমাণ ইট প্রস্তুত করতে বছরে প্রায় ৫০ লাখ টন কয়লা ও ২৭ লাখ টন জ্বালানি কাঠ পোড়ানো হয়, যা বছরে প্রায় ১৫ মিলিয়ন টন গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। এবারের বিশ্ববসতি দিবস-২০২১, বাতাসে কার্বনের পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে একটি সময় উপযোগী প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছে। "Accelerating Urban Action for a Carbon-free World" এই প্রতিপাদ্য HBRI এর গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক। HBRI-এর গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক। HBRI গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ইটের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবন করে আসছে এবং HBRI ক্যাম্পাসে ও স্বল্প পরিসরে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করে আসছে।

১. HBRI-এ উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তিসমূহ

১. কম্প্রেসড স্টেবিলাইজেড আর্থ ব্লক Compressed Stabilized Earth Block (CSEB):

বিবরণ

ড্রেজিং সয়েলের সাথে ১০% সিমেন্ট মিশিয়ে চাপ প্রয়োগের (compression) মাধ্যমে Compressed Stabilized Earth Block (CSEB) তৈরি করা হয়।

সুবিধাসমূহ

(ক) কৃষি জমি রক্ষা করে
(খ) ব্যয় সাশ্রয়ী
(গ) বনজ সম্পদ ব্যবহার রোধ করে ও কার্বন নির্গমণ হ্রাস করে,
(ঘ) ব্লক তৈরির মাধ্যমে নদ নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং সয়েলের ব্যবহার করার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা হবে এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

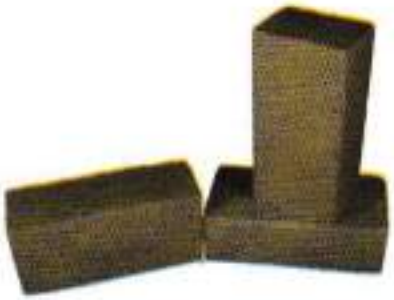

চিত্র-১: (CSEB) কম্প্রেসড স্টেবিলাইজেড আর্থ ব্লক

[১]মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট
[২]প্রজেক্ট অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

২. ইন্টারলকিং কম্প্রেসড স্টেবিলাইজেড আর্থ ব্লক Interlocking (CSEB) Block

বিবরণ

ড্রেজিং সয়েলের সাথে ১০% সিমেন্ট মিশিয়ে চাপ প্রয়োগের (compression) মাধ্যমে Compressed Stabilized Earth Block (CSEB) তৈরি করা হয়। এই ব্লকগুলো নির্দিষ্ট ফর্মায় তৈরি করা হয়।

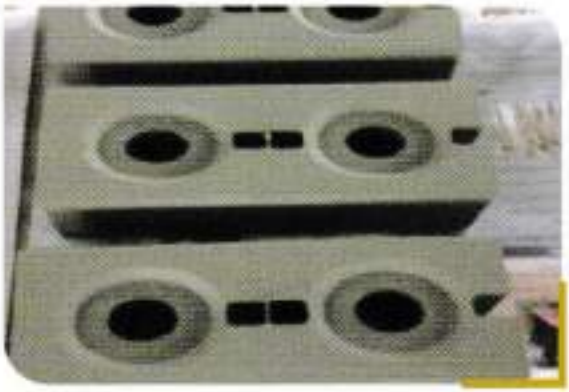

চিত্র-২: ইন্টারলকিং কম্প্রেসড স্টেবিলাইজেড আর্থ ব্লক

সুবিধাসমূহ

(ক) সময় ও খরচ কম।

(খ) নির্মাণে মর্টারের প্রয়োজন নেই।

৩. থার্মাল ব্লক Thermal Block:

বিবরণ

বালির সাথে সিমেন্ট মিশিয়ে এক্সপান্ডেড পলিস্টাইরিন শিট [Expanded Polystyrene Sheet (EPS)] ব্যবহার করে থার্মাল ব্লক তৈরি করা হয়।

চিত্র-৩ : থার্মাল ব্লক Thermal Block

সুবিধাসমূহ

(ক) হালকা ওজনের ব্লক।

(খ) শব্দ, তাপ ও আর্দ্রতা প্রতিরোধক এবং সাশ্রয়ী।

৪. স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক Sand Cement Hollow Block:

বিবরণ

কংক্রিট হলো ব্লক (Concrete Hollow Block) ভারবাহী বা অ-ভারবাহী দেয়াল নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। হলো ব্লক ভালো অন্তরক হিসেবে কাজ করে এবং শব্দ, তাপ ও আর্দ্রতা প্রতিরোধক। সাধারণত ২০% সিমেন্ট এবং ৮০% বালি মিশিয়ে এই ব্লক তৈরি করা হয়।

চিত্র-৪ : স্যান্ড সিমেন্ট হলো Sand Cement Hollow Block

সুবিধাসমূহ

(ক) ব্যয় সাশ্রয়ী।

(গ) সারা বছর ব্যাপী উৎপাদন করা সম্ভব।

(গ) শব্দ শোষণ ক্ষমতা বেশি, অগ্নি ও তাপ নিরোধে অধিক কার্যক্ষম।

৫. স্যান্ড সিমেন্ট সলিড ব্লক Sand Cement Solid Block

বিবরণ

ড্রেজিং বালির সাথে সামান্য পরিমাণে সিমেন্ট এবং HBRI কর্তৃক উদ্ভাবিত এডমিক্সার (HBRI কেমিক্যাল) মিশিয়ে কাঙ্খিত মানের Sand Cement Solid ব্লক তৈরি করা হয়।

সুবিধাসমূহ

(ক) ব্যয় সাশ্রয়ী, টেকসই এবং এর Compressive Strength পোড়া মাটির ইটের চেয়ে বেশি।

(খ) ব্লকগুলোর Water Absorption কম এবং শব্দ ও তাপরোধী।

চিত্র-৫ : স্যান্ড সিমেন্ট সলিড ব্লক Sand Cement Solid Block

৬. নন ফায়ার হাই স্ট্রেন্থ ব্লক

বিবরণ

এই ব্লক স্থানীয় ভাবে প্রাপ্য বালির সাথে যার এফ এম ১.২৫ এর বেশি ও সিলেট স্যান্ড এর সমান অনুপাতে মিশ্রন করে সিমেন্ট ও কেমিক্যাল এডমিক্সার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। যার গড় কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ ৫০০০ পিএসআই এর অধিক।

সুবিধাসমূহ

(ক) ব্লকগুলো রাস্তায় ব্যবহার উপযোগী।

(খ) ব্লকসমূহ পরিবেশবান্ধব এবং ব্যয় সাশ্রয়ী।

চিত্র-৬ : নন ফায়ার হাই স্ট্রেন্থ ব্লক

৭. ফেরোসিমেন্ট টেকনোলজি Ferrocement Technology

বিবরণ

ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে গ্যালভানাইজড তারজালির দুইপাশে সিমেন্ট মর্টার দেওয়া হয়।

সুবিধাসমূহ

(ক) দামে সস্তা ও দীর্ঘস্থায়ী, এতে মরিচা ধরে না ও এর নির্মাণ কৌশল সহজ।

(খ) সহজেই সংযোজন করা যায় এবং এর ওজন কম।

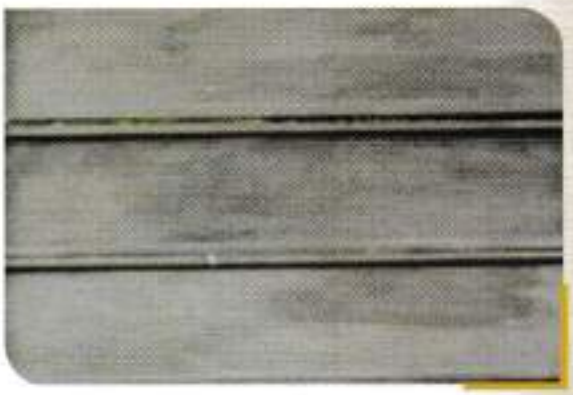

চিত্র-৭ : ফেরোসিমেন্ট টেকনোলজি Ferrocement Technology

৮. ফেরোসিমেন্ট স্যান্ডউইচ প্যানেল Ferrocement Sandwich Panel

চিত্র-৯: ফেরোসিমেন্ট স্যান্ডউইচ প্যানেল Ferrocement Sandwich Panel

বিবরণ

পলিস্টাইরিন শিটের দুই দিকে ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি (wire mesh) ব্যবহার করে ফেরোসিমেন্ট স্যান্ডউইচ প্যানেল তৈরি করা হয়। এই প্যানেল বিল্ডিং এর দেয়ালে এবং ছাদে ব্যবহার করা যায়।

সুবিধাসমূহ

(ক) অধিকতর সুষম এবং শব্দ ও তাপরোধী।

(খ) প্রি-ফেব্রিকেটেড গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব।

(গ) ভূমিকম্প সহনীয়।

২. HBRI-এ স্থাপিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনের প্লান্ট

পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী শুধু উদ্ভাবনই নয়, এর সঠিক প্রয়োগ ও পরবর্তী গবেষণার জন্য এবং এর নিয়মিত চাহিদা পূরণের জন্য HBRI ক্যাম্পাস-এ কয়েকটি প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্লান্টগুলোতে নির্মিত সকল নির্মাণ সামগ্রীই পরিবেশবান্ধব, ব্যয় সাশ্রয়ী, দুর্যোগে ঝুঁকিমুক্ত। এই প্লান্টগুলো শুধু যে গবেষণার জন্য ও নির্মাণ করা হয় না বরং সাধারণ জনগণ বিশেষ করে যারা অল্টারনেটিভ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের বিকল্প উৎপাদনে আগ্রহী তারা এই প্লান্টগুলোর কার্যকারিতা সরেজমিনে দেখতে পারবে ও এই নির্মাণ কৌশল তাদের প্রকল্পে কাজে লাগাতে পারবে।

HBRI-এ স্থাপিত দুইটি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনযোগ্য প্লান্টের বর্ণনা করা হলো:

১. জাপানি প্রযুক্তির নন-ফায়ার্ড সলিডিফিকেশন ব্রিক এর পাইলট প্লান্ট

চিত্র-১০: নন-ফায়ার্ড সলিডিফিকেশন ব্রিক এর পাইলট প্লান্ট

চিত্র-১১: নন- ফায়ার্ড সলিডিফিকেশন ব্রিক

চিত্র-১২: নির্মাণ সামগ্রী ক্যাম্পাসের বাউন্ডারি ওয়াল-এ প্রয়োগ

পাইলট প্লান্ট-এর বর্ণনা

জাপানি প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব নন-ফায়ার্ড সলিডিফিকেশন ইটগুলোর পাইলট প্লান্ট উৎপাদন-এর প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ব্লকগুলোর রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে। HBRI-এর ল্যাবরেটরিতে এই ব্লকগুলোর পারফরম্যান্স পরীক্ষাও করা হয়েছে। পরবর্তীতে, পর্যবেক্ষণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য এই ব্লকগুলো অনেক পরিমাণে উৎপাদন করা হয়েছে।

২. অটোক্লেভ এরিয়েটেড কংক্রিট Autoclave Aerated Concrete (AAC) প্লান্ট

চিত্র-১৩: অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট
Autoclave Aerated Concrete (AAC) প্লান্ট

চিত্র-১৪: অটোক্লেভড এরিয়েটেড কংক্রিট প্লান্ট-
প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে

অটোক্লেভ এরিয়েটেড কংক্রিট (AAC) প্লান্ট-এর বর্ণনা:

AAC ব্লক লোকাল বালি, লাইম, এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, অল্প পরিমাণ সিমেন্ট মিশিয়ে অটোক্লেভিং করে প্লান্ট এর মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। এটি ব্যয় সাশ্রয়ী, লাইট ওয়েটেড, পরিবেশবান্ধব ম্যাটেরিয়াল এবং ভূমিকম্প সহনীয় ও অগ্নি প্রতিরোধক। বর্তমান সময়ের জন্য এই প্রযুক্তিতে উৎপাদন অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং সাশ্রয়ী। সরকারের মাটি পোড়ানো ইট পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার যে পরিকল্পনা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে বিকল্প নির্মাণ উপকরণ হিসেবে AAC ব্লক অত্যন্ত কার্যকরী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্লান্টটির কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৩. HBRI এ উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে নির্মিত স্থাপনা

গবেষণার উদ্দেশ্যে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তির কার্যকারিতা, সহজলভ্যতা, স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষতা এবং স্থায়ীত্বের কথা চিন্তা করে HBRI-এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকটি স্থাপনা নির্মিত হয়েছে যার সব কয়টি স্থাপনা এখন বসবাস অথবা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর গবেষণালব্ধ ফলাফল সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর সুবিধামূলক বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ জনগণের কাছে প্রচার করতে ও এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি স্থাপনায় এইসব উদ্ভাবনী পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে।

HBRI ক্যাম্পাসে পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে নির্মিত কয়েকটি স্থাপনা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. HBRI ডিসপ্লে সেন্টার

প্রজেক্টের বর্ণনা

(ক) স্থাপনার অবস্থান- HBRI ক্যাম্পাস
(খ) স্ট্রাকচার: আরসিসি
(গ) পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী: থার্মাল ব্লকসহ ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী
(ঘ) ফ্লোর: ফেরো সিমেন্ট চ্যানেল
(ঙ) ছাদ: ফেরো সিমেন্ট ফ্লোটেড প্লেট
(চ) টোটাল ফ্লোর এরিয়া- ১৫,২০০ বর্গফুট

চিত্র-১৫: HBRI ডিসপ্লে সেন্টার

২. পাঁচ তলা ফেরোসিমেন্ট মডেল হাউস

প্রজেক্টের বর্ণনা:

(ক) লোকেশন- HBRI ক্যাম্পাস

(খ) তলার সংখ্যা- পাঁচ (৫)

(গ) মোট মেঝের এলাকা -৭৫৮৩ বর্গফুট

(ঘ) ফ্লোর: ফেরো সিমেন্ট চ্যানেল

(ঙ) ফাউন্ডেশন ও বিম-কলাম - আরসিসি

(চ) মেঝে এবং ছাদ - ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল

(ছ) প্রাচীর- ফেরোসিমেন্ট এবং স্যান্ড-সিমেন্ট ব্লকসহ ও অন্যান্য পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী।

চিত্র-১৬ : পাঁচ তলা ফেরোসিমেন্ট মডেল হাউস

৩. HBRI-এর মূল ফটক

প্রজেক্টের বর্ণনা

(ক) লোকেশন: এইচবিআরআই এর মূল ফটক

(খ) মেটেরিয়াল: ফেরসিমেন্ট ও পরিবেশবান্ধব ব্লক

চিত্র-১৭ : HBRI-এর মূল ফটক

৪. HBRI ট্রেনিং সেন্টার:

প্রজেক্টের বর্ণনা:

(ক) লোকেশন- HBRI ক্যাম্পাস।

(খ) তলার সংখ্যা- ২ (দুই) তলা।

(গ) মোট মেঝের এলাকা - ৮০০০ বর্গফুট।

(ঘ) ফ্লোর এবং ছাদ - ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল।

(ঙ) ফাউন্ডেশন ও বিম-কলাম - আরসিসি।

(চ) ওয়াল-এ ব্যবহৃত মেটেরিয়াল: পরিবেশবান্ধব ব্লক।

চিত্র-১৮ : HBRI ট্রেনিং সেন্টার

৫. HBRI পাবলিক টয়লেট

প্রজেক্টের বর্ণনা

(ক) লোকেশন: HBRI ক্যাম্পাস

(খ) ওয়াল-এ ব্যবহৃত মেটেরিয়াল: থার্মাল ব্লক ও ফেরোসিমেন্ট ওয়াল

(গ) ছাদ: প্রিকাস্ট ফেরোসিমেন্ট করোগেটেড শিট ও প্রিকাস্ট ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল

(ঘ) ফ্লোর-এ ব্যবহৃত মেটেরিয়াল: ফেরোসিমেন্ট
পেইভমেন্ট টাইলস ও স্যান্ড সিমেন্ট টাইলস

চিত্র-১৯ : HBRI পাবলিক টয়লেট

৬. HBRI মডেল হাউস-৩ (কাস্ট ইন সিটু)

প্রজেক্টের বর্ণনা:

(ক) লোকেশন: HBRI ক্যাম্পাস

(খ) ওয়াল-এ ব্যবহৃত মেটেরিয়াল: থার্মাল ব্লক, CSEB এবং হলোব্লক

(গ) ছাদে ব্যবহৃত মেটেরিয়াল: প্রিকাস্ট ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল

(ঘ) টোটাল এরিয়া: ১৩০০ বর্গফুট

(ঙ) ফুটিং: প্রিকাস্ট পকেট ফুটিং

(চ) সিঁড়ি: ফেরোসিমেন্ট সিঁড়ি

চিত্র-২০। HBRI মডেল হাউস-৩

৭. উপকূলীয় এলাকার জন্য স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক ও ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে নির্মিত রেজিলিয়েন্ট গৃহ:

প্রজেক্টের বর্ণনা:

পরিবেশবান্ধব ফেরোসিমেন্ট চ্যানেল এবং হলো ব্লক ব্যবহার করে স্বল্প প্রতিষ্ঠানে উপকূলীয় এলাকার উপযোগী মডেল গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র-২১: উপকূলীয় এলাকার জন্য স্যান্ড সিমেন্ট হলো ব্লক ও ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে নির্মিত রেজিলিয়েন্ট গৃহ

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ নিযুক্ত দক্ষ গবেষকগণ নিত্যনতুন সময় উপযোগী, দুর্যোগে সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রী উদ্ভাবন ও এর ব্যবহারের পর ফলাফল নির্ণয় করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমান সরকার শুধু বাস্তবমুখী উন্নয়নই নয় বরং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি উন্নত বাংলাদেশ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপহার দিতে সর্বদা কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় HBRI, দেশ ও জাতি সর্বোপরি সমগ্র বিশ্ববাসীকে একটি সুস্থ পরিবেশ দিতে সর্বদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের সর্বস্তরের আগ্রহী জনগণকে HBRI-এ উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর বর্ণনা ও নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI)
১২০/৩ দারুস-সালাম, মিরপুর, ঢাকা
ওয়েবসাইট: www.hbri.gov.bd

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান ভাস্কর্য

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে নির্মিত রূপচাঁদা ভাস্কর্য

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যটন নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে নির্মিত ভাস্কর্য

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যটন নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে নির্মিত স্বাধীনতা ম্যুরাল

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে ২৬০০ বাস্তহারা পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্পের তালিকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে
মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদ এমপি

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে ২৬০০ বাস্তহারা পরিবারের পুনর্বাসন প্রকল্পের তালিকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে
মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা

রাজধানীর আজিমপুরে বসবাসের অযোগ্য পুরাতন জরাজীর্ণ আবাসিক ভবন ভেঙে নির্মিত ১৭টি ২০ তলা বিশিষ্ট ভবন (১,২৯২টি ফ্ল্যাট), বাস্তবায়নে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০
[ভলিয়াম ১-৩]

বিশ্ব বসতি দিবস-২০২১

উদ্‌যাপন কমিটি

ভিডিও প্রস্তুত এবং সম্প্রচার সংক্রান্ত উপ কমিটি

১.	**জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন**, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	**জনাব মোঃ শওকত আলী**, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	**জনাব কাজী ওয়াসিফ আহমেদ**, সদস্য (প্রকৌশলী), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	**জনাবা নায়লা আহমেদ**, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	**জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান**, উপসচিব (বাজেট),গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	**জনাব নুর শাহরিয়ার বিন রহমান**, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রির্চাস ইন্সটিটিউটের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৪.	**জনাব মোঃ শহিদুল আলম**, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	সদস্য সচিব

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন উপ কমিটি

১.	**জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন**, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	আহবায়ক
২.	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, এইচবিআরআই, ঢাকা।	সদস্য
৪.	সদস্য (পরিকল্পনা), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।	সদস্য
৫.	সদস্য (প্রশাসন), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা।	সদস্য
৭.	**জনাব আবুল কালাম আজাদ**, উপসচিব প্রশাসন-২ অধিশাখা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৮.	**জনাব মাহবুবুর রহমান**, উপ সচিব (বাজেট অধিশাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৯.	**জনাব নায়লা আহমেদ**, উপ সচিব, প্রশাসন শাখা-৫, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
১০.	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১১.	প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরিকালচার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
১২.	ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	**জনাব স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল**, নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
১৪.	**জনাব ফয়সাল হালিম**, নির্বাহী প্রকৌশলী, ইডেন গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
১৫.	**জনাব মোঃ মুহিব্বুল ইসলাম**, নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।	সদস্য
১৬.	সিস্টেম এনালিস্ট, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
১৭.	উপসচিব (প্রশাসন-১ অধিশাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য সচিব

বাণী সংগ্রহ ও ক্রেস্ট/স্মরণিকা প্রকাশনা সংক্রান্ত উপ কমিটি

১.	**জনাব আঃ গাফফার খান**, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন-১, অণুবিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	আহবায়ক
২.	**ফাহমিদা সুলতানা**, তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।	সদস্য
৩.	**এস.এম. নজরুল ইসলাম**, উপসচিব (উন্নয়ন শাখা-৭), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৪.	**লৎফুন নাহার**, উপসচিব (প্রশাসন শাখা-৬), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৫.	**জনাব তাজিমুর রহমান**, উপসচিব (উন্নয়ন শাখা-৮), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৬.	**জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম**, উপসচিব (উন্নয়ন শাখা-১৪), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৭.	**জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী**, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৮.	নগর পরিকল্পনাবিদ (পরিকল্পনা প্রণয়ন), রাজউক, ঢাকা।	সদস্য
৯.	নগর গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিনিধি।	সদস্য
১০.	**লিয়াকত আলী ভূইয়া**, ভাইস প্রেসিডেন্ট (১ম), রিহ্যাব।	সদস্য
১১.	**জনাব তারিক হাসান**, সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা শাখা-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য সচিব

সেমিনার বাস্তবায়ন উপ কমিটি

১.	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	সদস্য (প্রকৌশল ও সমন্বয়)জাতীয় গৃহায়নকর্তৃপক্ষ, ঢাকা	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা	সদস্য
৪.	আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	**জনাব নায়লা আহমেদ**, উপ-সচিব, প্রশাসন-৫	সদস্য
৭.	**সায়কা বিনতে আলম**, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	**ড. সৈয়দা সায়কা বিনতে আলম**, প্রজেক্ট অফিসার, এইচবিআরআই, ঢাকা।	সদস্য
৯.	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউটট অব প্ল্যানার্স	সদস্য
১০.	সেন্টার ফর আরবান ফোরামের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	**মাহফুজা আক্তার**, কোয়ালিশন ফর দ্যা আরবান পুওর	সদস্য
১২.	**জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান**, ইউএন হ্যাবিটেট-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	**এম. তৌফিকুর রহমান খান**, সম্পাদক (সেমিনার), ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস্	সদস্য
১৪.	**জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন**, সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৫.	টাউন প্ল্যানার (বাস্তবায়ন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
১৬.	**এ. কে.এম. আব্দুল মোত্তালেব**, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স	সদস্য
১৭.	**জনাব আহমেদ আখতারুজ্জামান**, উপ-পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	সদস্য সচিব

স্মরণিকা প্রকাশ উপ কমিটি

১.	**জনাব আ ন ম আল ফিরোজ**, অতিরিক্ত সচিব, (মনিটরিং), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	আহবায়ক
২.	যুগ্মসচিব, প্রশাসন ব্রাঞ্চ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	**জনাব অভিজিৎ রায়**, উপসচিব, প্রশাসন শাখা-৩, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	**শেখ নুর মোহাম্মদ**, উপ সচিব, আইন কর্মকর্তা-২, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	**মুহম্মদ কামরুজ্জামান** (উপ সচিব), পরিচালক (প্রশাসন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬.	**জনাব সায়কা বিনতে আলম**, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৭.	**জনাব শাহীন হোসেন**, অতিরিক্ত পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তর	সদস্য
৮.	**মোঃ রবিউল আউয়াল**, সহকারী সচিব, বাজেট শাখা-১৬	সদস্য
৯.	**ড. সৈয়দা সায়কা বিনতে আলম**, প্রজেক্ট অফিসার, এইচ বি আর আই, ঢাকা	সদস্য
১০.	নগর গবেষণা কেন্দ্রের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	**জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী**, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
১২.	বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স	সদস্য
১৩.	সম্পাদক (প্রকাশনা), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস	সদস্য

১৪.	**জনাব উদয় শংকর দাস**, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৫.	ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৬.	**জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন**, সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৭.	**জনাব মোঃ শামসুর রহমান**, সাধারণ সম্পাদক, ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স	সদস্য
১৮.	**জনাব নায়লা আহমেদ**, উপসচিব (প্রশাসন শাখা-৫) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

প্রচার বাস্তবায়ন উপ কমিটি

১.	**জনাব শওকত আলী**, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	আহবায়ক
২.	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি।	সদস্য
৩.	**জনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ**, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪.	**জনাব মাহমুদুর রহমান হাবিব**, উপসচিব, উন্নয়ন শাখা-৯, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৫.	**জনাব মো. আশরাফ**, নগর পরিকল্পনাবিদ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
৬.	**জনাব রেজাউল করিম সিদ্দিকী**, জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৮.	বাংলাদেশ বেতারের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৯.	**জনাব লিয়াকত আলী ভূঁইয়া**, ভাইস প্রেসিডেন্ট (১ম), রিহ্যাব।	সদস্য
১০.	**জনাব মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন**, উপসচিব (উন্নয়ন শাখা-১৫), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	সদস্য সচিব

বিভাগীয় পর্যায়ে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত উপ কমিটি

১.	**জনাব পলাশ কান্তি বালা**, অতিরিক্ত সচিব (অডিট), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	আহবায়ক
২.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (সংস্থাপন ও সমন্বয়) গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩.	সদস্য (পরিকল্পনা, নকশা ও বিশেষ প্রকল্প), জাতীয় গৃহায়নকর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	সদস্য
৪.	উপপ্রধান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫.	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৬.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৭.	খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৮.	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
৯.	**জনাব মাকসুদ হাসেম**, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।	সদস্য
১০.	**জনাব লুৎফুন নাহার**, উপ সচিব, প্রশাসন-৬, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার